দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ২ ডিসেম্বর ২০১৯।। ১৫ অগ্রহায়ণ - ১৪২৬।।
যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

## মহাপুরুষের লাঞ্ছনা

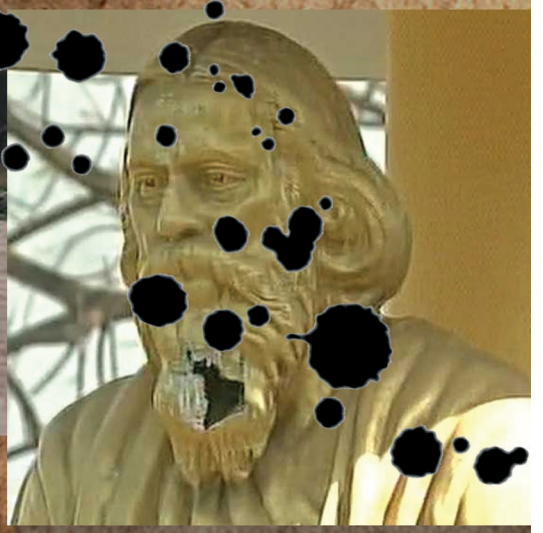

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭২ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২ ডিসেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।




# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপদের মুখে দাঁড় করিয়েছেন বিরোধীরা** ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

**খোলা চিঠি : লাথি সংস্কৃতি** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

**সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ হতে গেলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা বুঝতে হবে** ▯ চেতন ভগত ▯ ৮

**আট বছর পরেও সংবাদপত্রের শাপমোচন হলো কি?** ▯ সুজিত রায় ▯ ১১

**স্বামী বিবেকানন্দ ও বামপন্থী কুৎসা** ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১৩

**রবির গায়েও কাদা ছোঁড়ে, এদের কী হবে গা!** ▯ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ▯ ১৫

**শ্রীঅরবিন্দকে বিকৃত করেছে বামেরা** ▯ সঞ্জয় সোম ▯ ১৭

**বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিতাড়নের নতুন কৌশল** ▯ ২৩

**সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পীঠস্থান কাশী** ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৮

**বঙ্গজীবনের অঙ্গ অঘ্রানের মুলাষষ্ঠী** ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

**রাঢ় বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ধারা লেটো গান** ▯ তিলক সেনগুপ্ত ▯ ৩৩

**গল্প : ডানা** ▯ পিণ্টু ভট্টাচার্য ▯ ৩৫

**বঙ্গভূমির এক বিস্মৃতপ্রায় পিয়ানো-প্রতিভা** ▯ কৌশিক রায় ▯ ৩৮

**নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও কমিউনিস্টরা** ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ৪৩

**অযোধ্যা মামলায় ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং মানুষের বিশ্বাস একে অপরের পরিপূরক** ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ৪৪

**ভারতের আশ্রয়প্রার্থী 'কিং অফ করাচি'** ▯ প্রিয়দর্শী সিনহা ▯ ৪৬

**নিয়মিত বিভাগ**

**উবাচ : ১০** ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২**▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর ২০১৯

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## রাজ্য বনাম রাজ্যপাল

ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপাল একটি রাজ্যের সাংবিধানিক অভিভাবক হিসেবে গণ্য হন। অথচ জগদীশ ধনকড় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নেবার পর থেকে তৃণমূল সরকার তাঁর সঙ্গে অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক আচরণ শুরু করেছে। একদিকে রাজ্য প্রশাসন রাজ্যপালের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করছে, অন্যদিকে তৃণমূলের নেতারা তাঁকে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— রাজ্য বনাম রাজ্যপাল। লিখবেন সুজিত রায়, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, বিমল শঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

**দাম : বারো টাকা মাত্র**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
**AXIS Bank - Kolkata**
Branch : **Shakespeare Sarani**


সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*

# সম্পাদকীয়

## দেশের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব

সম্প্রতি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বামপন্থী উগ্র এবং উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির গাত্রে অকথা-কুকথা লিখিয়া স্বামীজীকে অবমাননা করিয়াছে। এই প্রথম যে ইহারা এইরূপ কাণ্ড ঘটাইল—তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। ইতিপূর্বেও ইহারা অনুরূপ কর্ম করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধ শতবর্ষে, ২০১৩ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি বামপন্থী উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রীরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি ভাঙচুর করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বারেবারেই এই বামপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায় হইতে বামপন্থী তাত্ত্বিক অরবিন্দ পোদ্দার—সকলেই স্বামীজীর অবদানকে খাটো করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। সিপিআই (এম)-এর প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত তো একদা কহিয়াছিলেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসিলে বেলুড় মঠকে কফি হাউস বানাইয়া ছাড়িব।' প্রমোদবাবু জীবিত থাকিলে আজ দেখিতে পাইতেন, বেলুড় মঠ স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় সিপিআই (এম)-এর পার্টি অফিসগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বামীজীর জন্মের সার্ধশতবর্ষে অতি বামপন্থী বিভিন্ন পত্রপত্রিকা স্বামীজী সম্বন্ধে অশ্লীল কুৎসা রটাইতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। অবশ্য শুধু স্বামীজী নহেন, বাঙ্গলার বহু মনীষীই এই বামপন্থী—অতি বামপন্থীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন। যে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে একদা ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ জাগ্রত হইয়াছিল, সেই বন্দেমাতরমেরই স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এই বামপন্থীরাই 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়াছে। এই বামপন্থীরাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বুর্জোয়া কবি' আখ্যা দিয়া তাঁহাকে বর্জন করিবার আবেদন জানাইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রাজশক্তির সহযোগী হইয়া এই বামপন্থীরাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে 'তোজোর কুকুর' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল। ঋষি অরবিন্দও ইহাদের কুৎসা হইতে মুক্তি পান নাই। অরবিন্দের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে নিছকই 'হিন্দুত্ববাদী' তকমা দিয়া খাটো করিবার চেষ্টা এই বামপন্থীরাই করিয়াছে। ফলে, আজ যখন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি আরও একবার কলঙ্কিত করেছে এই অতি বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা, তখন অবাক হইবার কিছুই থাকে না। ইহারা নিজেরাই নিজেদের চরিত্র আগেও প্রকাশিত করিয়াছে, এখনও করিতেছে।

প্রশ্ন হইল, বামপন্থী এবং অতি বামপন্থীরা বারেবারেই মনীষীদের প্রতি এই আক্রমণ হানিতেছে কেন? মনে রাখিতে হইবে স্বাধীনতার লগ্ন হইতেই বামপন্থীরা একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত কখনো চাহে নাই। বরং, স্বাধীনতার লগ্নে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি ছিল, ভারত রাষ্ট্রটিকে ছোটো ছোটো কতকগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেওয়া হউক। যে দাবি আবার এতদিন পরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদপপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টুকরে টুকরে গ্যাং'য়ের কণ্ঠে শুনা যাইতেছে। আসলে এই বামপন্থীরা কখনই ভারতবাসীকে 'এক জাতি' হিসাবে মানিতে রাজি হয় নাই। ভারতবর্ষের প্রতি এই ঘৃণাই দেশের মনীষীদের প্রতি এই উচ্ছৃঙ্খল বামপন্থীদের আক্রমণাত্মক করিয়াছে। অথচ দেশের ইতিহাস যদি ইহারা অধ্যয়ন করিত, ভারতের পরম্পরা সম্পর্কে ইহারা যদি শ্রদ্ধাশীল হইত—তবে অনুধাবন করিত স্বামী বিবেকানন্দ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতীক নন, রবীন্দ্রনাথকেও কোনো বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তাঁহারা সমগ্র ভারতের, সমগ্র ভারতবাসীর অস্মিতার প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে কুকথা লিখিয়া ইহারা স্বামীজীকে ম্লান করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। বরং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা আত্মাবমাননা।

## সুভাষিতম্

*বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তেষু ভোজনম্।*
*বৃথা দানং ধনাঢ্যেষু বৃথা দীপো দিবাঽপি চ।।*

*সমুদ্রে বৃষ্টিপাত ব্যর্থ। ভরপেট ব্যক্তিকে ভোজন করানো ব্যর্থ। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দান করা ব্যর্থ এবং দিনেরবেলা প্রদীপ জ্বালানো ব্যর্থ।*

# ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপদের মুখে দাঁড় করিয়েছেন বিরোধীরা

**বিশ্বামিত্র-র কলম**

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখনও মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের ভাগ্য কেউ জানে না। দেবেন্দ্র ফড়নবীশ তাঁর সরকার ধরে রাখতে পারবেন কিনা তা সময়ই বলবে। হয়তো এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভাগ্য অনেকটাই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পশ্চিমবঙ্গের তিনটি উপনির্বাচনের ফল আসেনি। ফল আসতে আসতে এই প্রতিবেদনও প্রকাশিত হবে। সুতরাং জ্যোতিষবিদ্যা ফলানোর জন্য এই প্রবন্ধ নয়। ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে নানাধরনের মন্তব্য এই দুটি ঘটনাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

প্রথম মহারাষ্ট্রের বিষয়টি নিয়ে শুরু করা যাক। বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন। কেন না গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে রাতারাতি ফড়নবীশ, অজিত পাওয়ার মন্ত্রীসভার শপথ হয়েছে, ঘোড়া কেনা-বেচা অর্থাৎ হর্স ট্রেডিং চলছে ইত্যাদি। আসলে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ মোদী অমিত শাহের জন্য হয়নি, বিরোধীদের গণতান্ত্রিক মানসিকতাটা সামগ্রিক ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। এর পেছনে বামপন্থী নাকি মমতা ব্যানার্জি সে বিতর্কে ঢুকছি না। কিন্তু এটা স্পষ্ট রাজনৈতিক পরাজয় বিরোধীরা মানতে পারছে না। বিজেপি জিতলেই সেটা হয়ে যায় ইভিএম হ্যাকিং, বিরোধীরা জিতলে 'জনগণের জয়'। হরিয়ানা-মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনেও এক্সিট পোলে বিজেপির জয়জয়কার দেখে বিরোধীপক্ষ ইভিএম কারচুপির গন্ধ পেয়েছিল। পরে ফল ভালো হতে 'কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর জনগণের অসন্তোষ' টের পায়। এই মানসিকতাই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে ইদানীং কলুষিত করছে, বিপন্ন করছে।

এই নীচু মানসিকতা, গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা এককালে ভারতের কমিউনিস্টদের মজ্জাগত ছিল। পরে তাঁর ছোঁয়াচ লাগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর, এখন গণতন্ত্রের এই মারণব্যাধি সারা দেশের বিরোধীদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে বহুকাল একটি এক দলীয় ধারা ছিল। সংখ্যার বিচারে কংগ্রেস একক গরিষ্ঠতা লাভ করে বহু যুগ দেশে শাসন কায়েম রেখেছিল। বাজপেয়ীজীর এনডিএ তেরো দলের সরকার গড়ে সেই একদলীয় শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানে। তারপর থেকে একদলীয় শাসনের ধারাটাই বদলে যায়। এক দলীয় শাসনের প্রধান পাণ্ডা কংগ্রেসও বহুদলীয় ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়ে গঠন করে ইউপিএ। লোকসভা আসনের বিচারে সংখ্যালঘু কংগ্রেস বাকিদের সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করে।

এই বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় আবার টুঁটি টিপে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। সেই নতুন ফর্মুলা হলো একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়া। মমতা ব্যানার্জি সূত্র দিয়েছিলেন যে যেখানে শক্তিশালী সে সেখানে প্রার্থী দেবে। এই ফর্মুলাই মানা হলো অনেকাংশে। বিগত নির্বাচনে, এখন নির্বাচন পরবর্তীতেও। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মায়া-অখিলেশ মিলে গেল, স্বার্থের কারণে নির্বাচনী জোট না হলেও কংগ্রেস-কেজরিওয়াল হাত ধরাধরি করল, নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গী হয়েও শিবসেনা প্রতিপক্ষ কংগ্রেস-এন সিপির সঙ্গে হাত মেলাল। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস হাত মিলিয়ে রাজনীতির বহুমতকে পদদলিত করার সূত্রপাত করে। এখানে কি নীতি-নৈতিকতা কোনো কিছু অবশিষ্ট আছে? শুধু ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করা ছাড়া?

**বিজেপি ইচ্ছা করলেই একক ক্ষমতায় সরকার চালাতে পারতো। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির ছিল। কিন্তু মোদীর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ী যে ভারতীয় রাজনৈতিক ঘরানাকেই বদলে দিয়েছিলেন তাকেই আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই মোদী-অমিত শাহ বহুদলীয় সংস্কৃতিকেই স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন।**

বিজেপি ইচ্ছা করলেই একক ক্ষমতায় সরকার চালাতে পারতো। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির ছিল। কিন্তু মোদীর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ী যে ভারতীয় রাজনৈতিক ঘরানাকেই বদলে দিয়েছিলেন তাকেই আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই মোদী-অমিত শাহ বহুদলীয় সংস্কৃতিকেই স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। বহুমতকে পদদলিত করার সূত্রপাত করে। এখানে কি নীতি-নৈতিকতা কোনো কিছু অবশিষ্ট আছে? শুধু ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করা ছাড়া?

বিজেপি ইচ্ছা করলেই একক ক্ষমতায় সরকার চালাতে পারতো। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির ছিল। কিন্তু মোদীর পূর্বসূরি অটলবিহারী বাজপেয়ী যে ভারতীয় রাজনৈতিক ঘরানাকেই বদলে দিয়েছিলেন তাকেই আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই মোদী-অমিত শাহ বহুদলীয় সংস্কৃতিকেই স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। দেশবাসীও এই সংস্কৃতির পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু বিদেশি মদত পুষ্ট বিরোধীরা যেনতেনপ্রকারণে ক্ষমতা দখলে এতই মদমত্ত যে ইতিপূর্বে কর্ণাটক বা গোয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় বিজেপির পক্ষে গেলেও স্রেফ আসন সংখ্যার খেলায় বিজেপিকে পেড়ে ফেলতে চেয়েছিল, অমিত শাহের কৌশলী চালের কাছে নতিস্বীকার করেছে সেটা অন্য বিষয়। মহারাষ্ট্রেও একক দল হিসেবে বিজেপিই শ্রেষ্ঠ। জনগণের রায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলে অনৈতিক জোট হতে পারলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ তাতে নেওয়া হলে বিজেপির পাল্টা কৌশলে বাজিমাত করা, অবশ্যই গণতান্ত্রিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে থেকে, তাকে যারা অগণতান্ত্রিক বলে আয়নায় নিজের মুখ দেখার সময় হয়েছে তাঁদের।

একই ভাবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশজুড়ে গণতন্ত্রের শোচনীয় পরিণাম ভেবে রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁর বিরোধী দলের এক ভোটপ্রার্থীকে এক দুষ্কৃতীর পদাঘাত করা এবং তৃণমূলের নেতাদের তাদের বালখিল্যসম আচরণের মধ্যে দিয়ে সেই দুষ্কৃতীকে 'নিজেদের লোক' বলে মান্যতা দেওয়া--- আশা করি এহেন গণতান্ত্রিক পরিবেশে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সুখনিদ্রা সম্পন্ন হবে। তাই বলছিলাম কেন্দ্রে বিরোধীদের মানসিকতা না পাল্টালে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের বিপন্নতা কাটবে না। ■

# লাথি সংস্কৃতি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

পশ্চিমবঙ্গে নতুন 'লাথি সংস্কৃতি'-কে স্বাগত জানান।

সেদিন নদীয়ার করিমপুর বিধানসভার উপনির্বাচন ছিল। বুথে বুথে কেমন ভোট হচ্ছে তা দেখতে ঘুরছিলেন বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদার। কারও কারও গোঁসা হয়ে যায় তা নিয়েই। তাই কোনও বলা কওয়া নেই, সোজা মার। কিল, চড়, ঘুষি। এমনকী লাথিও। এমন জোরে লাথি মারা হয়েছে যে জয়প্রকাশ ছিটকে পড়েন রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে।

তারপর সেই ছবি রাষ্ট্র হয়েছে। গোটা দেশ দেখছে। আর বুঝেছে, বাঙ্গলা সত্যিই এগিয়ে। গোটা দেশ কাল ভাববে কিন্তু বাঙ্গলা আজই ভেবে ফেলেছে লাথি সংস্কৃতির কথা। ছাপ্পা ভোট থেকে রক্তাক্ত ভোট সবের পাওনিয়র বাঙ্গলা এখন নতুন পেটেন্টের দাবি করতে পারে। প্রার্থীকে সপাটে লাথি। ভূভারতে যা আগে দেখা যায়নি।

ক'দিন আগেই লোকসভা ভোট হলো দেশজুড়ে। কই এমন তো কোথাও হয়নি। এই তো সেদিন নগরপালিকা ভোট হয়েছে কর্ণাটকে। রাজ্যে শাসনক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেসের কাছে পিছিয়ে পড়েছে বিজেপি। কই তখনও তো এমন ছবি দেখা যায়নি। তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেতেই কেন?

গত বছর পঞ্চায়েত ভোটের কথাই ধরা যাক। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। সেবারও ভোটের দিন কোথাও ব্যালট পেপার পুকুরের জলে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। কোথাও গণনার দিন গণনাকেন্দ্রে ঢুকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব্যালট। খুন হয়েছিলেন শাসক-বিরোধী শিবিরের বহু কর্মী। তখনও মুখ পুড়েছিল বাঙ্গলার। লোকসভা ভোটেও মারধর কম হয়নি। তারপর এবার করিমপুরে।

সকলেই দেখেছেন যে জয়প্রকাশবাবুকে লাথি মারা 'লুঙ্গি পরা' ওই লোকটা তৃণমূলের। তবু তৃণমূলের দাবি ও বিজেপিরই। এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত সেই বিতর্কের মীমাংসা হয়নি। হওয়ার দরকারই বা কী! দিদির রাজ্যে দিদির দল যা বলবে সেটাই বেদবাক্য। কিন্তু ওই ব্যক্তি কোন দলের সেটা কি আদৌ কোনও আলোচ্য বিষয়! সমস্যা আসলে অনেক বড়ো।

নির্বাচনে এই মারধর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠছে। বঙ্গের বাইরে কারও মুখে এই সমালোচনা শুনলে হয়তো রাগ হতে পারে, অস্বস্তি হতে পারে, অপমানিতও হতে পারেন। কিন্তু এটাই বাস্তব। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এমন নেতিবাচক ধারণাই কঠিন পাথরের মতো জাঁকিয়ে বসেছে ভূভারতে।

তবে ভোটে এই সংস্কৃতির আমদানি করেছে বামেরাই। আরও স্পষ্ট করে বললে সিপিএম। পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীদের মনোনয়ন পেশ করতেই দেব না। মনোনয়ন পেশ করলে তাকে ভয় দেখিয়ে হোক, মেরে হোক, ধরে হোক, প্রত্যাহার করিয়েই ছাড়ব। তাও না পারলে ভোট লুঠ করব। দীর্ঘদিন সেই অরাজকতা চলার পরে তিতিবিরক্ত মানুষ মুক্তি চেয়েছিল। রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পরিবর্তনের পরিবর্তে দেখা গেল, ভোটে চড়াম চড়াম দড়াম দড়াম শব্দে কান পাতা দায়। এমন করে গুড় বাতাসার কথা বলা হয়, আবার তাঁদের মহিমান্বিতও করা হয়, যেন যাবতীয় নিদান দেওয়ার দায়ভার তাঁদের উপরে। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে তাঁরা এমন ভাব দেখান যে পুলিশ প্রশাসনও তাঁদের সামনে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ— কুছ পরোয়া নেহি। কচু কাটতে কাটতে ডাকাত হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা এক শ্রেণী। কারও কারও সেটাই নেশা, পেশা এবং রুটিরুজি! বিরোধী প্রার্থীকেই ধরে মারো। পুলিশের সামনেও পদাঘাতে দ্বিধা নেই। ভয় নেই। একে লুম্পেনরাজ বললেও হয়তো কমই বলা হয়।

কথাগুলো কী একটু দিদি-বিরোধী হয়ে গেল! এই রে...

**—সুন্দর মৌলিক**

# সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ হতে গেলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা বুঝতে হবে

**অতিথি কলম**

**চেতন ভগত**

ইংরেজি বলা তথাকথিত প্রগতিশীল প্রজাতির বুদ্ধিজীবীরা আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদী আচরণ নিয়ে আজকাল খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়ছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে— (১) স্বাধীন বৌদ্ধিক সংস্থাগুলির অবমাননা করা যাচ্ছে। (২) একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হিন্দু অ্যাজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (৩) দেশের সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিকের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। (৪) কোনো প্ররোচনা ছাড়াই মুসলমান নাগরিকদের বিরুদ্ধে হিংস্র অপরাধমূলক আচরণ করা হচ্ছে। (৫) আর এস এস ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। (৬) সর্বোপরি চলতি সরকার হিন্দু আধিপত্যবাদীদের সমর্থন করে চলেছে। একেবারে সাম্প্রতিক দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অযোধ্যা বিবাদ সংক্রান্ত মহামান্য আদালতের রায়ে মন্দির নির্মাণের মীমাংসাকেও সেই একই মানসিকতায় বিচার করা হচ্ছে। আজকের পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কিই বা আশা করা যায়? আদালতের রায় সত্ত্বেও এদের ভাবটা এমনই। এই শ্রেণীর উদারবাদীদের নজরে সমস্ত হিন্দুই হলো অত্যাচারী আর সংখ্যালঘু মুসলমানরা হলো অত্যাচারিত। এই দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে সমগ্র মুসলমান সমাজের ওপর অবিচার করার তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমানদের বাড়তি নিরাপত্তা ও আরও শক্তিশালী করে তোলা দরকার, কেননা আজকাল হিন্দুরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

এই সরলীকরণ ও পূর্ব ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলে তাঁরা আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিল ইতিহাসটিই ভুলে যাচ্ছেন। এই সমস্ত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা বিদেশি সংবাদমাধ্যম বা নিবন্ধকারদের লেখালিখি যেগুলির গরিষ্ঠাংশই তাদের মনগড়া তীব্র পাশ্চাত্য প্রেমের সঙ্গে খাপ খায় তার প্রতি অন্ধভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন। তাদের মতামতকেই একেবারে কপি পেস্ট করতেও পেছপা হচ্ছেন না।

এই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা স্তরে রয়েছে নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের উদারবাদী সর্বজ্ঞ সাংবাদিকরা। তাঁরা সর্বদাই সঠিক। এর ফলে এই বিদেশি প্রতিবেদন, মিডিয়া বিতর্কগুলি থেকে উঠে আসা মতামতই তাঁরা মহানন্দে দেশের নিজস্ব পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করেন। পাশ্চাত্য প্রতিবেদনগুলির নিজস্ব পরিমণ্ডলে হুবহু পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে এমন একটি বিশ্ববীক্ষা তৈরি করতে চান যা আগাগোড়াই পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও ধারণা নির্ভর।

বলা দরকার, এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মিডিয়া দ্বারা তাঁরা কেবলমাত্র প্রভাবিত হন এমনটা নয়। তাঁরা অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো চিন্তাপ্রসূত মতামত প্রয়োগের প্রশ্নই নেই। পরিপ্রেক্ষিতের ভূমিকা এঁদের কাছে অবান্তর। যেমন যদি পশ্চিমি দুনিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার নিয়ে আলোচনা সূত্রে বলা হয় গরিষ্ঠাংশ শ্বেতাঙ্গরা তাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত গরিষ্ঠাংশটা কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নামিয়ে আনছে। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা সেই সংবাদকে তত্ত্বে পরিণত করে চিৎকার শুরু করে দেবেন যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিপন্ন। কেননা হিন্দুরা গরিষ্ঠাংশ আর মুসলমানরা সংখ্যালঘু। এই ফর্মুলায় হিন্দুরা শ্বেতাঙ্গদের মতোই বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী হওয়ায় মুসলমানদের বঞ্চনা করছে। অত্যাচার করছে।

যদিও বাস্তবে ভারতে হিন্দু-মুসলমান প্রেক্ষাপট আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সম্পর্কের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। আমেরিকার ক্ষেত্রে অতীতে একপক্ষীয় অত্যাচার চালানোর একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। মার্কিন দেশে কৃষ্ণাঙ্গদের আনাই হয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কেনা বেচা ও প্রয়োজনে দুর্ব্যবহার করার জন্যই। এই মলিন উত্তরাধিকার সহজে মুছে যাওয়ার নয়। আমেরিকা এখনও এর মেকাবিলা করছে।

ভারতের ক্ষেত্রে পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। (১) মুসলমান শাসকরা দীর্ঘ শতাব্দী ধরে মূলত হিন্দু প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। দেশের হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করে তার ওপর নির্মিত হয়েছিল অজস্র মসজিদ। হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা বুঝতে এই বিষয়টি কি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক? (২) ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় কেবলমাত্র মুসলমানরা যাতে অতি সুখ-শান্তিতে বাস করতে পারে সে কারণে দেশ দু' টুকরো করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পরে তা ভেঙে আবার বাংলাদেশ। পাকিস্তান কিন্তু সে দেশে হিন্দুদের বসবাসের সুযোগ দেয়নি। ভারত দিয়েছে। কোটি কোটি মুসলমান তাই নিরুপদ্রবে এখানে বসবাস করতে থাকে। তারা, দেশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এই বিষয়টাও কি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা বোঝার সহায়ক নয়?

অনেকে বলবেন কেন অপ্রাসঙ্গিক ইতিহাস খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে। এতে লাভ কী? এখন তো এসব প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু দেখুন দেশে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখতে এই যুক্তিটিকে কেমন কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন উচ্চবর্ণের একটা বড়ো অংশ যারা নিম্নবিত্ত তাদের মেধাবী ছেলে- মেয়েরা পর্যাপ্ত পরিশ্রম করে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলেও বহু ক্ষেত্রেই তার মনমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে জায়গা পায় না। এর কারণ ইতিহাস নিহিত। তাদের মেনে নিতে হয় যে মোট আসনগুলির মধ্যে ৫০ শতাংশে তাদের মেধা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকলেও কোনো অধিকার নেই। ওই

আসনগুলি নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষিত, কেননা তারা উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা বহু শতাব্দী আগে লাঞ্ছিত হয়েছিল। অবশ্যই আমরা এখন ২০১৯ সালে বসবাস করছি। যেখানে সদা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাসের ঘোরের মধ্যে থাকা কাম্য নয়। এগিয়ে যেতে গেলে আমাদের কিছু কিছু বিবাদিত বিষয়কে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই শ্রেয়। কিন্তু তার মানে কখনই এই নয় যে ধর্মনিরপেক্ষ হতে গেলে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে আমাদের আবহমানকালের সংস্কৃতি, প্রথা, মূল্যবোধকে অস্বীকার করতে হবে বা হিন্দুত্ব নামের জাতিসত্তা জীবন পদ্ধতিকে এড়িয়ে যেতে হবে। ভুলে যেতে হবে নিপীড়নের ঐতিহাসিক সত্যকে। একইভাবে হিন্দুত্বের অন্যতম প্রধান আরাধ্য দেবতার পূজা অর্চনার কারণে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দাবি জানালে তা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদ বলে গণ্য হতে পারে না।

তেমনই কাশ্মীরে দীর্ঘ হিংসা ও অন্যায়ের পরিস্থিতির দেশহিতে যথাযোগ্য মোকাবিলা করা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদ নয়। বরঞ্চ ৩০ বছর আগে যেদিন কাশ্মীর থেকে হিন্দুদের নাগাড়ে বিতাড়ন করা হয়েছিল সেদিনই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রয়োজনীয় আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। সেই হিসেবে ভুল শোধরাতে আমরা ৩০ বছর দেরি করে ফেলেছি।

মনে রাখতে হবে, ভারতই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে সর্বাধিক পরিমাণ হিন্দুর বসবাস। তাই যদি আমরা এই ধর্মটিকে রক্ষা করার বদলে সদা সর্বদা এটিকে নিকৃষ্ট, প্রকৃতিগতভাবে আক্রমণাত্মক ইত্যাদি বলে খাটো করে দেখাতে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত নির্লজ্জ। আমাদের জন্য ধিক্কার ছাড়া কিছু নেই। কেননা অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছেই হিন্দুত্ব কোনো নিছক ধর্মবিশ্বাস নয় এটি সমগ্র ভারতীয়দের কাছেই একটি দীর্ঘ অনুসৃত সংস্কৃতি।

সেই কারণে এদেশে সঠিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে যদি বুঝতে হয় তাহলে দুটো দিকই বিবেচনা করতে হবে। মেনে নিতে হবে ভুল উভয় পক্ষেরই হয়েছিল। মেনে নিতে হবে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়েছিল বেশি মাত্রায়। সম্প্রতি হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই তারা তাদের সেই অতীত যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ বিস্তৃত হবে এমনটা নয়। যন্ত্রণা বোধের স্মৃতি কেউ কেড়ে নিতে পারে না এবং ফলশ্রুতিতে দু'একটি হিসেব চোকানোর প্রবণতাকেও অস্বীকার করা যায় না। আমরা সামগ্রিক পটভূমিতে ঘটনাক্রমকে বিচার করতে পারলে তবেই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলির মর্যাদা রক্ষা করতে পারব।

অবশ্যই রাস্তার মধ্যে কোনো লোককে পিটিয়ে মারা অন্যায়। কিংবা কোনো জমায়েতের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোককে মারধরও সমর্থন যোগ্য নয়। নির্দ্বিধায় বলা যায় এগুলি অপরাধ। আমরা নিশ্চয় দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে বদলে ফেলতে পারি না বা আমাদের ধর্মবিশ্বাস অন্য কারুর ওপর চাপিয়েও দিতে পারি না। কিন্তু খেলার এই নিয়ম দু' পক্ষের ক্ষেত্রেই সমপ্রযোজ্য। যে কারণে দুম করে কোনো সম্প্রদায়কে অসহিষ্ণু বলে দাগিয়ে দিলে সেই পক্ষের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কোনো সংশোধনেরও সুযোগ থাকে না।

ভারত নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু দেশের বর্ণময় ইতিহাস ও হিন্দুত্বের সঙ্গে দেশবাসীর অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র ও হিন্দুত্বভিত্তিক অবস্থান কখনই অস্বীকার করা যাবে না, সে চেষ্টা করাও উচিত নয়। নিউ দিল্লি নিউ ইয়র্ক নয়, বারাণসীও ওয়াশিংটন নয় আর আজমের তো আলাবাসা নয়ই। সঠিক চিন্তাপ্রসূত অবস্থানে থাকতে গেলে পাশ্চাত্যের অবধারণাগুলিকে ভারতে কপিপেস্ট করার অপচেষ্টা অন্যায্য। প্রত্যেক ঘটনাকে তার পরিপ্রেক্ষিত, পরিমণ্ডল সাপেক্ষে বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই একজন সঠিক শিক্ষিত মানুষ ও সেই অর্থে একজন যথার্থ বুদ্ধিজীবীকেও পাওয়া যায়। ■


*রাষ্ট্রায় স্বাহা, রাষ্ট্রায় ইদং ন মম*

## আহ্বান : দেশের জন্য এক বছর সময় দান করুন

জমিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের কারণে চাষে ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে চাষিভাইরা চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন। এইসব কৃষিপণ্যের ফলে মানুষ বিভিন্নভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। গ্রামে রোজগারের অভাবে মানুষ শহরের দিকে পলায়ন করছে। গো-পালন ছেড়ে দেওয়াতে গো-বংশ কসাইয়ের হাতে চলে যাচ্ছে।

চাষিদের এবং গো-বংশকে এই গভীর সংকটময় অবস্থা থেকে রক্ষা করলেই গ্রাম ও দেশ রক্ষা হবে। এর জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষিদের গো-ভিত্তিক চাষ ও গো-ভিত্তিক জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করাতে হবে। এতে গোরুর দ্বারা চাষির রক্ষা হবে ও চাষির দ্বারা গোরুর রক্ষা হবে। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করার পথ।

**পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে এই জ্ঞান-আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রেমী, গো-প্রেমী, সেবা-ভাবী যুবক-যুবতীদের আহ্বান করা হচ্ছে, যারা বাড়ি ছেড়ে ন্যূনতম এক বছর সময় এই মহৎ কাজের জন্য দান করবেন।**

এই বিষয়ে পথনির্দেশ, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সংস্থার দ্বারা করা হবে। বয়সসীমা ৩৫-৫০ বছর।

লিখিত আবেদন নিম্ন ঠিকানা বা ই-মেলে পাঠাতে পারেন—

**গো-সেবা পরিবার**

৫২৪-বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৩

E-mail : gosevaparivar@gmail.com

www.gosevaparivar.org

# রম্যরচনা

## স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা

বউ বাপের বাড়ি গিয়ে মজা করার জন্য এস এম এস পাঠাল :

মনের ভেতরে আমার ভালোবাসা খুঁজে নিয়ো
আর রুটির আটা ভালো করে মেখে নিয়ো।
ভালোবাসা পেলে সেটা হারিয়ো না
পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে চোখের জল ফেলো না।
আমার ওপর রাগ করার তোমার অনেক ছুঁতো আছে
আলুটা আর একটু সেদ্ধ করো, মনে হয় কাঁচা আছে।
আমি বাড়ি ফিরলে তুমি আবার খুশি হবে
মশলা একটু মিহি করে পিষবে।
লোকে আমাদের ভালোবাসা দেখে জ্বলবে,
ভাতটা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি নামাবে।

কেমন লাগল আমার কবিতা জানাবে। খাবারে নুন কম হলে একটু নুন মেখে নেবে।

**স্বামীর উত্তর :**

তোমার এই ভালোবাসা আমাকে মজনু বানিয়েছে, তোমার যাবার পরেই পাশের বাড়ির বউদি এসে রান্না করে দিয়ে গেছে।

তারপর আর কী... বউ ১২০ কিমি বেগে বাড়ি ফিরে এসেছে।

# উবাচ

"পৃথিবীর কোনো শক্তি আর অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণ আটকাতে পারবে না। কারণ সুপ্রিম কোর্ট রামমন্দির তৈরির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।"

**রাজনাথ সিংহ**
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

*ঝাড়খণ্ডের বিশ্রামপুরে নির্বাচনী জনসভায়*

"কখনই আমার রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা ছিল না। তবে এখন আমি এর অঙ্গ। কীভাবে জনগণের জন্য কাজ করা যায়, সেই চিন্তা থেকে নিজের সেরাটুকু দেবার চেষ্টা করছি।"

**নরেন্দ্র মোদী**
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

*সম্প্রতি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে*

"একজন প্রার্থীকে যদি নির্বাচনের দিন এভাবে মার খেতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। ৩৪ বছরের বাম শাসনেও এমনটা ঘটেনি।"

**মুকুল রায়**
বিজেপি নেতা

*করিমপুরের বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারের ওপর তৃণমূলি হামলা প্রসঙ্গে*

"যদি আমাদের কংগ্রেস-মুক্ত ভারত গড়তে হয় তাহলে প্রথমে কংগ্রেস-মুক্ত কর্ণাটক করতে হবে।"

**বি.এস. ইয়েদুরাপ্পা**
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী

*কংগ্রেসের নিথ্যাচারে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের অবনতি প্রসঙ্গে*

"ভারতের উদ্বেগের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। আমরা এমন কিছু করব না যাতে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।"

**গোটাবায়ো রাজাপক্ষ**
শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট

*শ্রীলঙ্কার চীন-নির্ভরতা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ প্রসঙ্গে*

# আট বছর পরেও সংবাদপত্রের শাপমোচন হলো কি?

**সুজিত রায়**

রামায়ণে রাম-সীতার বনবাস হয়েছিল ১৪ বছরের জন্য।

মহাভারতে দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস হয়েছিল ১২ বছরের জন্য। অতিরিক্ত শাস্তি হয়েছিল এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাস।

ফলাফল কী হয়েছিল?

রামায়ণে রামের পিতা রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করলেন। যাঁর জেদের কাছে হার মেনে দশরথ রামকে বনবাসে পাঠানোর চক্রান্ত করেছিলেন, সেই দাসী মন্থরা দশরথ-পুত্র শত্রুঘ্নর হাতে বেদম প্রহার খেলেন।

আর মহাভারতে?

পরিণতি হলো আরও করুণ।

কৌরবপক্ষের অধিনায়ক দুর্যোধন-সহ গোটা বংশই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেল। ওই দুর্যোধনের চক্রান্তেই বনবাসে যেতে হয়েছিল পাণ্ডবদের। আর যার অন্ধ স্নেহে দুর্যোধন পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্রের মৃত্যুর শোকে পাথর হয়ে বাণপ্রস্থের জীবন বেছে নেন এবং শেষ পর্যন্ত অরণ্যেই তাঁর চরম দুঃখে মৃত্যু হয়।

এসব ভারতীয় দুই মহাকাব্যের শাপ এবং শাপমোচনের গল্প। একবিংশ শতাব্দীতেও ঘটনা তেমনই এক শাপমোচনের কাহিনি। তবে এ কাহিনি কল্পিত নয়। বাস্তব। শাপমোচন হলো বাংলা সংবাদপত্রের। দীর্ঘ ৭ বছর ৮ মাস পর।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে স্বাধীনতার পর মোট চারবার ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ ক্ষমতার তখতে ছিল কংগ্রেস। ৬৭-৬৯ ও ৬৯-৭১ দু'দফায় রাজ্য শাসনের ক্ষমতায় আসে যুক্তফ্রন্ট। ১৯৭২-এ ভোটে জিতে রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্ব নেয় কংগ্রেস, চলে ১৯৭৭ পর্যন্ত। তারপর টানা প্রায় ৩৫ বছর ক্ষমতায় আসীন থাকে বামফ্রন্ট সরকার। ২০১১-য় ক্ষমতার বদল ঘটে। প্রশাসনের দায়িত্ব পায় তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার তেমন কোনও ভয়াবহ ইতিহাস নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯৭৫ সালে, যখন গোটা দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে। সে সময়ে গোটা দেশেই সংবাদপত্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সংবাদপত্রগুলিও সেই আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের গলা টিপে ধরার চেষ্টা আর কোনও সরকারই করেনি। বরং বামফ্রন্টের আমলে ধনী জোতদার সম্প্রদায় বা জমিদার পরিবারগুলি সম্পত্তি সংক্রান্ত নানা অধিকারে বঞ্চিত হলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। বরং ওই সময়েই বিভিন্ন পাঠাগারে বইপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চালু দৈনিক সংবাদপত্রগুলি রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই গড়ে উঠেছিল পাঠাগার আন্দোলন এবং তা জনশিক্ষা প্রসারেও সহায়তা করেছিল।

> **গত ৮ বছর ধরে যেমন বহু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। ভবিষ্যতেও মিলবে না। অন্তত এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে। ...সংবাদপত্রের শাপমোচন কি সত্যিই হয়েছে? বাংলা সংবাদপত্র কি একনায়কত্বের বাঁধন ছিঁড়তে পেরেছে? স্বাধীন হয়েছে সংবাদমাধ্যম? এই কলকাতায়? এই পশ্চিমবঙ্গে?**

সংবাদপত্রের ওপর এ রাজ্যে প্রথম কদর্য আক্রমণ হলো ২০১২ সালের ১ এপ্রিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে গোটা দেশ চেনে সংবাদপত্রের প্রশ্রয়েই বেড়ে ওঠা রাজনৈকি নেত্রী হিসেবে তিনি আচমকা অধ্যাদেশ জারি করলেন যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো পাঠাগারে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র (আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল ইত্যাদি) রাখা যাবে না। শুধুমাত্র রাখা যাবে দুটি উর্দু সংবাদপত্র-সহ মোট ৮টি অত্যন্ত স্বল্প পরিচিত বাংলা সংবাদপত্র যেমন ৩৬৫ দিন, কলম ইত্যাদি। এই সংবাদপত্রগুলি ছিল পুরোপুরি সরকারের কেনা বান্দা। নির্বাচিত সংবাদপত্রের মধ্যে ছিল কুখ্যাত চিট ফান্ড সংস্থা সারদা চিট ফান্ড পরিচালিত দুটি সংবাদপত্রও। যেগুলি চিটফান্ডটি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। পরে জানা যায়, ওই সংবাদপত্রগুলির কয়েকটির

মালিক আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের বিরুদ্ধে নানা দেশদ্রোহমূলক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এদর কেউ কেউ এখন আবার তৃণমূল কংগ্রেস দলের রাজ্যসভার সাংসদ।

সরকার পোষিত এই সংবাদপত্রগুলি কোনো সময়েই জনমানসে ভালো ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারেনি। এমনকী এখনও নয়। কারণ সবকটি সংবাদপত্রই ছিল শাসকদলের প্রচারপত্র। ফলত এগুলিকে পাঠকসমাজ 'সংবাদপত্র'-এর মর্যাদা দিত না, দেয়ও না।

সরকারি এই অধ্যাদেশের ফল হয়েছিল পুরোপুরি নেতিবাচক। দেখা গিয়েছিল, বহু পাঠক পাঠাগারে আসতেন একাধিক সংবাদপত্র পড়ার জন্য। কিন্তু বহুল প্রচারিত এবং উন্নত মানের সংবাদপত্রগুলি না থাকায় তাঁরা পাঠাগারে আসা বন্ধ করেছিলেন। ফলত পাঠাগার আন্দোলনই অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। আবার এও দেখা গিয়েছিল, বহু পাঠক সম্মিলিতভাবে চাঁদা তুলে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলি সমবায় পদ্ধতিতে পাঠাগারে বসে পড়তো। বিনা পয়সায় সরবরাহ করা সি পি এমের মুখপত্র গণশক্তির প্রবেশও রুদ্ধ করা হয়েছিল। পরিবর্তে সরকারি পয়সায় কেনা হতো তৃণমূলের প্রচারপত্র জাগো বাংলা, মা-মাটি-মানুষ যেগুলো খোলা বাজারেও চোখে দেখা যায় না।

শুধু এই ভাবে সংবাদপত্রগুলোর বিক্রির ওপরই আঘাত হানা হয়নি। সরকারিভাবে প্রথম শ্রেণীর দৈনিকগুলিকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো শুধুমাত্র সরকারের তথা শাসকদলের পছন্দের সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলিকে।

এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায় শহরে। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী মহলে শোরগোল ওঠে। কিন্তু একনায়কত্বের রাজত্বে তো সমস্ত বিচারের বাণীই নীরবে নিভৃতে কাঁদে। গত প্রায় ৮ বছর ধরে এই অভিসম্পাত বয়ে বেড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলি। হ্যাঁ 'সংবাদপত্রগুলি' বলছি শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর দৈনিক বা গ্রামীণ সংবাদপত্রগুলির কথা। বাকিগুলি তো বহু পাঠকের কাছেই ন্যাপকিন মাত্র।

গত ১৪ নভেম্বর সরকারি নির্দেশে শাপমুক্ত হয়েছে আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, প্রতিদিন, দ্য টেলিগ্রাফ। বলা হয়েছে, এগুলি আবার কিনবে পাঠাগারগুলি। প্রথম পর্যায়ে সরকারের তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়নি। ভাবা গিয়েছিল, এটা রাগবশত করেছেন, কারণ ক্ষমতায় আসার পরপরই তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কামদুনি, মেদিনীপুরের শিলদা ইত্যাদি অঞ্চলে যে আচরণ করেছিলেন, তা সংবাদপত্রে বিশাল জায়গা নিয়েছিল। হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল অম্বিকেশ মহাপাত্রকে নিয়ে। তৃণমূল নেত্রী প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সেখানেই ক্ষান্ত হননি। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি শুরু করেন মালিকপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে যাতে তারাও এক একটা ৩৬৫ দিন বা কলম পত্রিকা হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে প্রতিটি সংবাদপত্রের কতিপয় মোসাহেবি মনোভাবের সাংবাদিককে বেছে নেন মুখ্যমন্ত্রী যাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়— খবর লিখতে হবে কোনটা এবং কীভাবে। পরিবর্তে মিলবে নানা দাক্ষিণ্য। গদগদ ওই সব সাংবাদিকরা জিভের লালা সামলাতে পারেননি।

ফলত যা হলো, ২০১১-র ১ এপ্রিল রচিত হলো একটা নতুন এপ্রিল ফুলের ইতিহাস। সে ইতিহাসে লেখা হলো বাংলা সংবাদপত্রের কণ্ঠে 'কুকুরের বকলস' পরানোর কাহিনি আর সাংবাদিকতা ভুলিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের দিয়ে গল্প লেখানোর প্রশিক্ষণ। সৎ সাংবাদিকরা বলতে শুরু করলেন প্রকাশ্যে— এখন আমরা না লেখার জন্য মাইনে পাই। আর লিখলে আমাদের চাকরি যায়।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ও বাংলা সংবাদপত্রকে এ হাল চাক্ষুষ করতে হয়নি। তখনকার তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বহুবার বলেছেন, 'বিশ্বাস করুন, আমার লজ্জা লাগত বিশিষ্ট সাংবাদিকদের লেখা কাটতে, ছিঁড়তে আর জ্ঞান দিতে।' আজও তিনি মন্ত্রী। কিছু কি বলবেন? অন্তত জনান্তিকে?

সততার প্রতিমূর্তি মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্য ছিল ভালো সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যায় আঘাত করে, সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে সংবাদপত্র সংস্থাগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতার শিকড় কেটে দিয়ে শাস্তি দেওয়া। চাপ সৃষ্টি করা যাতে সেগুলি সরকারের বশংবদ হয়ে ওঠে। এও বাহ্য। আর একটা খেলা খেললেন তিনি। আজকাল-এর মতো সংবাদপত্রে মালিকপক্ষই বদলে গেল। বসিয়ে দিলেন বশংবদ এক ধনী ব্যবসায়ীকে। আর কী করলেন? বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হলো মুখ্যমন্ত্রীর বশংবদ এবং পোষ্য সাংবাদিকদের যাদের সরকারি দাক্ষিণ্যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে কয়েক বছরেই। পেট মোটা হয়েছে। সঞ্চিত পুঁজির পরিমাণ তাঁরাই বলতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের যোগ্যতার পরিমাপ মাপা হলো একটি মাত্র তুলাদণ্ডেই— কে কত বড়ো সরকার তথা শাসকদল তথা মুখ্যমন্ত্রীর চামচ কিংবা হাতা।

আজও বিস্ময় জাগে, বহু সংবাদপত্র (প্রায় প্রচারবিহীন) এবং বহু বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল (প্রায় দর্শকবিহীন) গুলির পিছনে টাকা ঢালছেন কে বা কারা? কেনই বা ঢালছেন? আর্থিক লাভ মিডিয়া থেকে হচ্ছে না সে তো সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু লাভ ছাড়া তো কেউ টাকা জলে ঢালবেন না। তাহলে নেপথ্যে খেলছে কোন খুড়োর কল?

এসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। গত ৮ বছর ধরে যেমন বহু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। ভবিষ্যতেও মিলবে না। অন্তত এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে। পরের সরকারে কারা আসবে, তারা কী করবে তা এখনই বলা শক্ত। এবং বঙ্গভাষী আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই। প্রশ্ন উঠছে— সংবাদপত্রের শাপমোচন কি সত্যিই হয়েছে? বাংলা সংবাদপত্র কি একনায়কত্বের বাঁধন ছিঁড়তে পেরেছে? স্বাধীন হয়েছে সংবাদমাধ্যম? এই কলকাতায়? এই পশ্চিমবঙ্গে? উত্তর দেবেন পাঠকরা, উত্তর দেবেন দর্শকরা, উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। ■

# স্বামী বিবেকানন্দ ও বামপন্থী কুৎসা

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শও করতে পেরেছিলেন তিনি। শৌখিন পর্যটকের ভ্রমণ বিলাসে নয়, পরিব্রাজক জীবনে যখন অশেষ দুঃখকে সঙ্গী করে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পরিব্রাজন করেছেন, তখনই বিবেকানন্দ চিনেছিলেন ভারতবর্ষকে। যে ভারতবর্ষ রাজারাজড়ার প্রসাদে সীমাবদ্ধ নয়। এমনকী নিতান্তই দেবদেউলেও আবদ্ধ নেই সে ভারতবর্ষ। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন কৃষকের কুটিরে, কামারের হাতুড়িতে। বুঝেছিলেন, ভারতের অন্তরাত্মা এরাই। এদের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে ব্রহ্মের শক্তি। এদের উত্থানেই প্রকৃত ভারতের উত্থান ঘটবে। বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল নতুন ভারতবর্ষ একদিন বেরিয়ে আসবে কৃষকের পর্ণকুটির, কামারের কামারশালা থেকে। ১৮৯৮ সালে ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গী করে যখন উত্তর ভারতের দিকে যাত্রা করেছেন তিনি, তখন শিষ্যা নিবেদিতাকেও ভারতের গ্রামীণ জীবনকে দেখিয়ে বলেছিলেন, রাজার হর্ম্য নয়, ভারতের প্রাণ ওই পল্লী কুটিরে। অন্ত্যজের উত্থানের ভিতর ভারত জেগে উঠবে, তার পরাধীনতার বন্ধন মোচন করবে— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই বিবেকানন্দকে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান্ধীর চরকা কাটার বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে সরসীলাল সরদারকে ১৯২৮ সালের ৯ এপ্রিল একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আধুনিককালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি— দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী যখনই মানুষকে সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।' বিবেকানন্দের আবেদনটি যে 'আমার কাছে ছিল', চরকা কাটার বাড়াবাড়িতে 'আঙুলের কাছে আবেদন' ছিল না, তা বোঝা যায় তা বোঝা বাঙ্গলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের জবানবন্দিতে। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা সকলেই স্বীকার করেছেন দেশের মুক্তি সংগ্রামে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। বিপ্লবী গণেশ ঘোষ লিখেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনে দেশের মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছিল কারা তাদের প্রকৃত শত্রু— তাদের দেশের কুসংস্কার, অনগ্রসরতা ও সামাজিক বৈষম্য রক্ষায় কাদের স্বার্থ? বিবেকানন্দ ইংরেজ দস্যুদের স্বরূপ কিছুটা চিনতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর কথায় প্রকাশ্য অভিব্যক্তি না থাকলেও দেশের যুবশক্তির কাছে থাকত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথ গ্রহণের ইঙ্গিত ও আহ্বান। তিনি সাধু ছিলেন কিন্তু তাঁর ভগবৎ উপাসনা দেশের রাজনীতিকে বাদ দেয়নি।' বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মোতিলাল রায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখও স্বীকার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি বিদেশে রুশ বিপ্লবের প্রেরণাপুরুষ পিটার ক্রপটক্রিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

> "বাঙ্গালি আবেগ ভাঙিয়ে যারা রাজনীতি করতে নেমেছেন তারাই বা স্বামীজীর অপমানে নিশ্চুপ কেন? বাঙ্গালির এই শ্রেষ্ঠতম সন্তানটির অপমানও তারা মাথা পেতে নেবেন? তাদের এই নিশ্চুপ থাকা কাদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে তাও প্রকাশ হওয়া দরকার।"

স্বামী বিবেকানন্দ অনুধাবন করেছিলেন দেশকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন জাতীয় চরিত্র গঠন। ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করা। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাব থেকে আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় পুনরুত্থানের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে।' এই নতুন ভারতকে জগৎসভায় হাজির করার লক্ষ্যেই জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনায় সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য নিবেদিতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। ১৯০১ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে দর্শকাসনের প্রথম সারিতে বসে

জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছিলেন। বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন জগদীশচন্দ্রের। চিকাগো যাত্রাপথে জাহাজে জামশেদজী টাটার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। পরে স্বামীজীর অনুরোধেই নিবেদিতা এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে টাটার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। স্বামীজীর আগ্রহে এবং নিবেদিতা ও টাটার উদ্যোগে বাঙ্গালোরে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়েও ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বিবেকানন্দকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন জামশেদজী টাটা। কিন্তু তখন বিবেকানন্দ ভগ্নস্বাস্থ্য। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তোলার কাছে ব্যস্ত। তাই রাজি হননি তিনি। সেই প্রতিষ্ঠানটিই আজ বাঙ্গালোরের সুবিখ্যাত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স।

যারা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর মূর্তিকে কলঙ্কিত করল তারা এই বিবেকানন্দকে জানল না, বোঝা তো দুরস্থান। তারা ধরেই নিল স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিকে কলঙ্কিত করার অর্থ রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি ও সঙ্ঘ পরিবারের বিরোধিতা করা। কিন্তু এই যে বিবেকানন্দ, যিনি বাঙ্গলার যুবকদের আত্মাকে ডাক দিয়েছিলেন, দেশে একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য জামশেদজী টাটার মতো শিল্পপতিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল বা পক্ষের নন। হতে পারেও না। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের প্রতীক। ভারতীয়দের অস্মিতার প্রতীক। এই বিবেকানন্দকে না চেনানোর দায়িত্বটা নিতে হবে স্বাধীনতার পর বামপন্থী এবং নেহরুপন্থী যে ঐতিহাসিকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তাদের। তাদের বিকৃত এবং অর্ধসত্য ইতিহাস পাঠ করে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে অধরা থেকে গেছেন এই বিবেকানন্দ। বামপন্থী এবং নেহরুপন্থী ঐতিহাসিকরা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব নিয়ে টুঁ শব্দটি কখনো করেননি। ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে কখনো লেখা হয়নি, বাঙ্গালোরের ওই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বীজটি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই বামপন্থী-নেহরুপন্থী ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ শুধুই একজন গৈরিকধারী হিন্দু সন্ন্যাসী— যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আসলে এই অস্বীকার করার, বিকৃত করার এবং অর্ধসত্য প্রচার করার পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, হিন্দু ভাবনার ওপর গড়ে ওঠা ভারতীয় পরম্পরাটি অস্বীকার করা। মনে রাখতে হবে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যই হলো হিন্দু দর্শন, হিন্দুধর্ম, হিন্দু পরম্পরার উপর আঘাত। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিবামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা সেই আঘাতটিই হানতে চেয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো— স্বামী বিবেকানন্দই এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কেন? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্যের কাছে ভিক্ষার ঝুলি হাতে যাননি।' ভারতকে জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দকে জানার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি চিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে মিশনারিদের কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতের বেদান্ত দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন। গেরুয়া পরিহিত এই সাইক্লোনিক মংক যে বারেবারেই ইউরোপীয় এবং আরবি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বামপন্থীদের আক্রমণের শিকার হবেন— সেটাই স্বাভাবিক। এবং হয়েছেনও তাই। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েরও আগে ২০১৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতি ভাঙচুর করে অতি বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা। তারও অনেক আগে সিপিএমের প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত দর্পভরে বলেছিলেন— 'আমরা ক্ষমতায় এলে বেলুড় মঠকে কফি হাউস বানিয়ে দেব।' প্রমোদবাবুর সে আশা অবশ্য পূরণ হয়নি। বরং এই ২০১৯ সালে এসে প্রমোদবাবুর দলের বহু পার্টি অফিসেই তালা পড়েছে। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অরবিন্দ পোদ্দার স্বামী বিবেকানন্দকে 'অচল' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। আর অতি বামপন্থী লেখক-লেখিকারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং পুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অশ্লীল কটূক্তি করেছে। এদেরই উত্তরসূরি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা স্বামীজীর মূর্তি কলঙ্কিত করবে— এতে আর আশ্চর্যের কী!

তবে, আশ্চর্য হতে হচ্ছে বাঙ্গালি বিদ্বৎসমাজ এবং বাঙ্গালি আবেগ ভাঙিয়ে যারা রাজনীতি করতে নেমেছেন তাদের দেখে। একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রীর হাতে স্বামী বিবেকানন্দকে কলঙ্কিত হতে দেখেও এরা নিশ্চুপ থাকেন। এই বাঙ্গালি বিদ্বৎসমাজের ভিতর কেউ কেউ আবার বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞ হিসাবেও সমাদৃত। বিবেকানন্দের ওপর রচিত তাদের পুস্তকগুলি বাজারে বিকোয় ভালো। কিন্তু বিবেকানন্দ লাঞ্ছিত হলে এরা কেন মুখ বুজে থাকেন— তা বুঝতে কষ্ট হয়। ভ্রম হয়— এরা কি সত্য সত্যই বিবেকানন্দ অনুরাগী, না রয়ালিটির লোভে বিবেকানন্দ প্রেমী। বাঙ্গালি আবেগ ভাঙিয়ে যারা রাজনীতি করতে নেমেছেন তারাই বা স্বামীজীর অপমানে নিশ্চুপ কেন? বাঙ্গালির এই শ্রেষ্ঠতম সন্তানটির অপমানও তারা মাথা পেতে নেবেন? তাদের এই নিশ্চুপ থাকা কাদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে তাও প্রকাশ হওয়া দরকার।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে— তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও তার সংস্কৃতির পক্ষে জ্বলন্ত বাসনার সুর তুলেছিলেন, তীব্র অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।' দুর্ভাগা ভারতীয় বামপন্থীরা, এই অগ্নিপুরুষ বিবেকানন্দকে খুঁজেই পেল না। ■

# রবির গায়েও কাদা ছোঁড়ে, এদের কী হবে গা!

**অভিজিৎ দাশগুপ্ত**

১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। ...সনাতন বলে পদার্থটার একেবারে জটে ধরে এরা টান মেরেছে। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্য একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে।'

আজ প্রায় নব্বই বছর পর রাশিয়ার চিঠির কোনও-না-কোনও পৃষ্ঠা যখনই খুলে বসি, কলেজ জীবনের অপার বিস্ময় একইভাবে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কী অসম্ভব মুক্ত মনের মানুষ; কমিউনিস্ট রাশিয়ার বন্ধ দরজার ওপার থেকে যতটুকু আলো তাঁর মনের উঠোনে এসে পড়ছে, নিঃশেষে তাকে গ্রহণ করায় তিনি মগ্ন। কারা কোথায় কতটুকু ভালো কাজ করল, জীবনভর তারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত কবি। অথচ আশ্চর্য, এমনই সমুদ্রের মতো অস্তিত্বের মানুষকে বাঁকা হাসি হেসে এদেশের বামপন্থীরা ডাকছেন 'বুর্জোয়া কবি' বলে। কখনও আড়ালে, কখনও বা প্রকাশ্যেই। কী তাঁর অপরাধ? রবীন্দ্রনাথ সম্পন্ন ঘরের মানুষ ছিলেন বলে? উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কয়েকটি জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে পড়েছিল বলে? ঠাকুর্দা দ্বারকানাথের কার অ্যান্ড টেগোর কোম্পানির রূপকথার মতো সাফল্যের পর ঠাকুর পরিবারে আর কেউ ব্যবসায়ে সফল হয়েছিলেন বলে শোনা যায়নি। এই বৃহৎ পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল জমিজমার আয়, আর রায়ত-প্রজাদের ষান্মাসিক-বাৎসরিক খাজনা। সেই পরিবারের ছেলে রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের মার্কামারা ভাবনাচিন্তার ছাঁচে ফেলে তৃপ্তির সঙ্গে বামেরা বলে বেড়ান— রবীন্দ্রনাথ তো বুর্জোয়া কবি, সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট উনি কী বুঝবেন?

সত্যি তো। কী-ই বা বুঝবেন বাঙ্গালির সব-হতে-আপন এই কবি? যৌবনের এক বিরাট সময়ে মাসের পর মাস শিলাইদহ- সাজাদপুরের মায়াবী প্রকৃতি আর আটপৌরে মানুষজনের মধ্যে বসবাস করতে হতো তাঁকে। কখনও পদ্মা-মেঘনার বুকে বজরায়, কখনও বা বিস্তীর্ণ ধানখেত আর ঝুরিনামা গাছপালার ছায়া-সুনিবিড় গ্রামে কোনও এক সাবেক দালানকোঠায়। জমিদারি দেখতেন রবীন্দ্রনাথ, প্রজা-রায়তদের সঙ্গে নিত্য দেখা হতো তাঁর। তাদের বেঁচে থাকা, তাদের সংগ্রাম, তাদের প্রেম ও প্রণয়, তাদের জন্ম-মৃত্যুর নিরবধি-চক্রের বড়োই আপনজন তিনি। যে আত্মীয়তার পরিচয় পরতে-পরতে লিপিবদ্ধ রয়েছে গল্পগুচ্ছের ছোটো ছোটো মরমি কাহিনিগুলোয়।

রাশিয়ায় সফররত রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল, একদা কৃষিনির্ভর এই বিরাট দেশ ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর কীভাবে প্রায় আদ্যোপান্ত বদলে গেল। তিনি লিখছেন, '১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল, তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষি আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখেনি।

আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, আজ এরা হয়েছে 'বলরামের দল।' নিজেদের পুরাণ, কাব্য আর লোককথার দর্পণে ওই দূর-দেশের নব অর্জিত অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের সারাৎসারটুকু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা— এ বড়ো সহজ ক্ষমতা নয়। বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথের

কলকাতায় অপমানিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। (ফাইল চিত্র)

**কখনও স্বামীজী, কখনও বা রবীন্দ্রনাথ। ওদের ভাষায় নেতাজী হলেন তোজোর কুকুর, রবীন্দ্রনাথ আকাশচারী বুর্জোয়া কবি। আর স্বামীজীকে নিয়ে কথা খরচ না করে তাঁর মূর্তিটাই দিল বিকলাঙ্গ করে। মূর্খদের কে বোঝাবে, ওদের অপকর্মে নেতাজী, স্বামীজী বা রবীন্দ্রনাথের কিছুই যায় আসে না। তাঁরা মানুষের হৃদয়ে শতপদ্ম হয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আর প্রত্যাখ্যানের আস্তাকুঁড়ে চলে যেতে হবে তাদের, যারা এতকাল নিজেদের অপরাজেয় বলে ভেবেছে।**

মতো তথাকথিত বুর্জোয়া কবির চোখের আলোতেই মার্কসীয় দর্শন আর সমাজচিন্তা অনেকখানি পড়ে নিতে পেরেছিলেন আমাদের বাঙ্গালি বামপন্থীরা। অনেক জট অনেক অস্পষ্টতা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কাছে। এর বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ কী পেলেন? কুৎসা এবং তাচ্ছিল্য। সঙ্গে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। রবীন্দ্রনাথকে এঁরা বলতে শুরু করলেন, 'রবি ঠাকুর? তিনি তো গজদন্ত মিনারে বসবাস করেন। আকাশচারী কবি কি না! আকাশ থেকে নামতেই চান না।'

আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু বামেরা এই চোখে তাঁকে দেখতেন না। বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙ্গালি বামপন্থী সমাজ। কবি বিষ্ণু দে বলুন কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র বলুন বা দেবব্রত বিশ্বাস— রবীন্দ্রনাথের উজার করে দেওয়া অসীম ঐশ্বর্যের কথা বারবার শতমুখে স্বীকার করে গেছেন। সুচিত্রা আর দেবব্রত তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই কাটিয়ে দিলেন সারাজীবন। ১৯৬১ সালে, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে কবিকে নিয়ে মননশীল প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে সময়ের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হীরেন মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদাররা। ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অত্যাশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা, সেটা বুঝতে সেকালের বামপন্থীদের এক মিনিটও সময় লাগেনি। কিন্তু কী অদ্ভুত, তাঁদেরই উত্তরসূরি সিপিএম ও বামফ্রন্ট বুদ্ধিজীবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন 'আনন্দবাদী কবি'। অর্থাৎ শুধু আনন্দ করা ছাড়া যিনি আর কিছুই বোঝেন না! জগতের, জীবনের আর যত সত্য আর বাস্তব— কিছুরই নাকি তাঁর কাছে কোনও মানে নেই। কেন তাঁকে নিয়ে একালের বামপন্থীদের এমন তীব্র অ্যালার্জি? কেন পদে-পদে তাঁকে হেয় করার অপমান করার চেষ্টা? সে কি কেবল এই জন্য যে, মানুষের স্বাধীনতার গলা টিপে ধরার কমিউনিস্ট প্রবণতাকে সহ্য করতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ? রাশিয়ার চিঠিতেই এক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে দেশের প্রতি এতখানি মুগ্ধতা দেখিয়েও রবীন্দ্রনাথ লিখতে ছাড়েননি, 'যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না।... রাশিয়ার অন্তরে বাহিরে শত্রু। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা পাকা করতে বলপ্রয়োগে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যতই জরুরি হোক, বল জিনিসটা একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না।'

চৌত্রিশ বছরের রাজ্যপাটের শেষে, ২০১১ সালে, কমিউনিস্টদের, আরও বেশি করে সিপিএমের এই রবীন্দ্র বিরোধিতার লাইনের জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে ছোটো করা, হেয় করার প্রবণতা বামপন্থীদের একটা মস্ত ভুল। মানুষ ভালোভাবে নেয়নি এই প্রচার। পছন্দ করেনি রাজ্যের প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে সহজপাঠকে বাদ দিয়ে দেওয়া।

মানুষের পাল্‌স বুঝতে এই সময়ের বামেরা যে কতখানি ব্যর্থ, সহজপাঠ-কাণ্ড তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিন্তু একা বুদ্ধ আর কত করবেন? ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য রবীন্দ্রবিরোধী বাম-বুদ্ধিজীবীদের তিনি নাম দিলেন 'বামন-বাহিনী'। বললেন, ওঁরা খণ্ডিত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখেন। এই দেখা রবীন্দ্রনাথকে সত্যিকারের দেখা নয়। কিন্তু ততদিনে ড্যামেজ যা হওয়ার হয়ে গেছে। মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বামেদের। সরকার থেকে, শিক্ষা থেকে, সংস্কৃতি থেকে। এমনকী সমাজ থেকেও।

ক্ষমতা গিয়েছে বটে, কিন্তু দম্ভ তো যাওয়ার নয়। যাদবপুর, জেএনইউ, এমন আরও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান— যেখানে ওরা এখনও নানাভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সব জায়গাতেই সেই অসহনীয় অহমিকার বহিঃপ্রকাশ। সেই উগ্র, আত্মঘাতী রাজনীতির দাপাদাপি। টার্গেট— কখনও নেতাজী, কখনও স্বামীজী, কখনও বা রবীন্দ্রনাথ। ওদের ভাষায় নেতাজী হলেন তোজোর কুকুর, রবীন্দ্রনাথ আকাশচারী বুর্জোয়া কবি। আর স্বামীজীকে নিয়ে কথা খরচ না করে তাঁর মূর্তিটাই দিল বিকলাঙ্গ করে। মূর্খদের কে বোঝাবে, ওদের অপকর্মে নেতাজী, স্বামীজী বা রবীন্দ্রনাথের কিছুই যায় আসে না। তাঁরা মানুষের হৃদয়ে শতপদ্ম হয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আর প্রত্যাখ্যানের আস্তাকুঁড়ে চলে যেতে হবে তাদের, যারা এতকাল নিজেদের অপরাজেয় বলে ভেবেছে। হ্যাঁ, ওই ছোটো ছোটো আশ্রয়গুলো থেকেও একদিন সরে যেতে বাধ্য করা হবে তাদের। করবেন তাদের সহপাঠী সতীর্থরাই। সেই দিনটা আর বেশি দূরে নেই। ■


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

| | | |
|---|---|---|
| Account Name | : | **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.** |
| A/C. No. | : | **917020084983100** |
| IFSC Code | : | **UTIB0000005** |
| Bank Name | : | **AXIS Bank Ltd.** |
| Branch | : | **Shakespeare Sarani, Kolkata** |

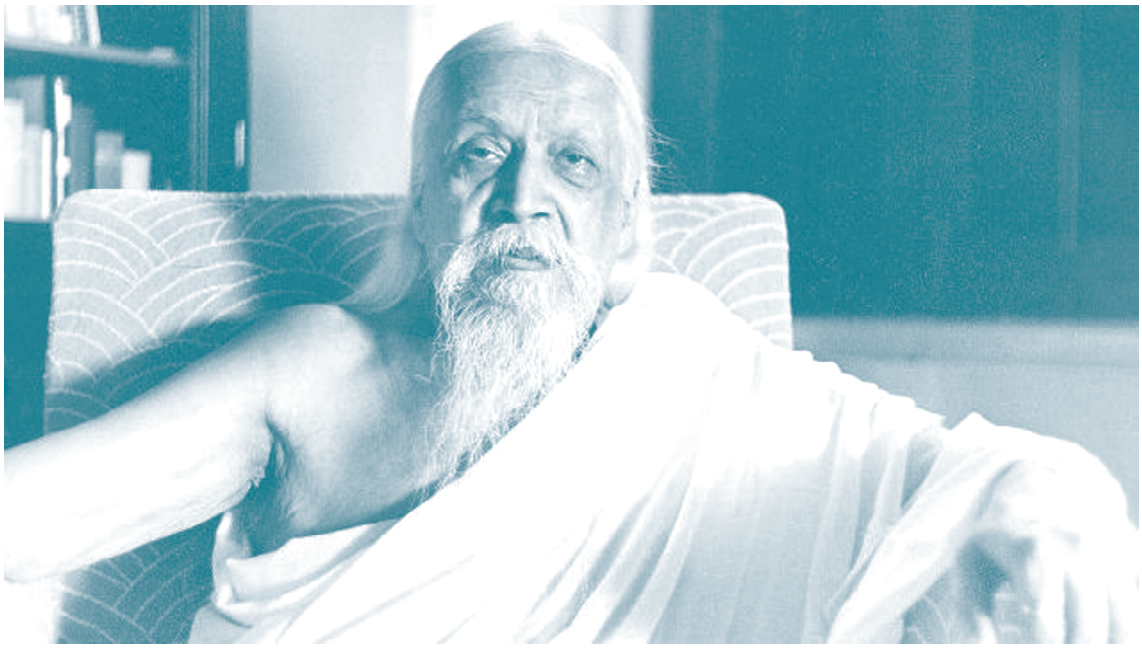

# শ্রীঅরবিন্দকে বিকৃত করেছে বামেরা

**সঞ্জয় সোম**

সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু অতিবামপন্থী ছাত্র-ছাত্রী স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির অবমাননা করেছে, যা সারাদেশে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন দেশপ্রেমী মানুষের মনে গভীর বেদনা ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছে। নিজেদের মনীষীদের মাহাত্ম্য এবং প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে এদের কোনো ধারণা বা শিক্ষাই নেই এবং তার জন্য এদের পরিবার, বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমানভাবে দায়ী। সারা দেশ যাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী বলে মনে করে, তাঁদের সম্পর্কে কুকথা বলা, অপপ্রচার করা এবং তাঁদের দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা করা নতুন কিছু নয়, ভারতের তথাকথিত বামপন্থীরা বংশপরম্পরায় এই ঘৃণ্য কাজটি করে আসছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজীর মতোই ঋষি অরবিন্দও তার ব্যতিক্রম নন। ওঁর আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে এরা হিন্দু জাতীয়তাবোধ বলে ব্যঙ্গ করেছে, দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে অনুশীলন সমিতির শক্তি আরাধনাকে এরা হিন্দুদের বিপ্লব বলে হেয় করেছে আর শ্রীঅরবিন্দর যোগসাধনাকে এরা পলায়ন প্রবৃত্তি বলে দুষেছে। এরা কোনোদিন বুঝতেই চায়নি যে আইসিএস অরবিন্দ ঘোষ থেকে শ্রীঅরবিন্দ হয়ে ওঠার আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে ভারতমাতার এই দিব্য সন্তানের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁর মাতৃভূমির প্রতি অশেষ প্রেম, ভক্তি ও দায়বদ্ধতা কোনোদিন এতটুকুও কমেনি। আজ এই নিবন্ধে সেই বিষয়ে আলোকপাত করবো।

যদিও ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস প্রথমবার পূর্ণ স্বরাজের জন্য দাবি তোলে, অরবিন্দ ঘোষ কিন্তু ১৯০২-এ অনুশীলন সমিতি স্থাপনাকালেই সেই লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন এবং ১৯০৬-এ দাদাভাই নৌরোজির সহযোগিতায় কংগ্রেসের চারদফা কর্তব্যসূত্র 'স্বরাজ, স্বদেশ, বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন স্থির করে দেন। তারপর ১৯০৭-এ কংগ্রেসের সুরত অধিবেশনে স্বরাজপন্থী এবং সীমিত স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্যের জেরে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে গেলে, অরবিন্দ গোটা ১৯০৭-০৮ ধরে পূর্ণস্বরাজের প্রবক্তা বালগঙ্গাধর তিলকের পক্ষ নিয়ে পুনে, বোম্বে এবং বরোদায় জনসম্পর্কের মাধ্যমে জনজাগরণ করতে শুরু করেন। ১৯০৮-এ আলিপুর বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে শ্রীঅরবিন্দ জেলে যান এবং সেখানে একবছর নির্জন কারাবাসকালে তাঁর অন্তরে গভীর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়। সহবন্দি প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সেই সময় রাতে ওঁর বন্দিশালা থেকে হালকা নীল জ্যোতি বেরোত এবং ভয়ে পুলিশকর্মীরা কেউ সামনে যেতেন না। ১৯০৯-এ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯১০-এ ওঁর পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার ফলে ভারতের ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নেয়, যার কথা আমরা জানি।

অনেকেই হয়তো জানি যে ১৯১০-এ শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে চার বছর পর, অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে সারা বিশ্বজুড়ে এমন উথালপাথাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে ভবিষ্যতে ইংরেজ বাধ্য হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের দাবিকে স্বীকার করে নিতে। আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

জার্মানিতে যে ভয়ংকর ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই সময় নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর জনপ্রিয়তা ও ১৯৪৬-এ বোম্বের নৌবিদ্রোহের কারণে ইংরেজ বুঝতে পারে যে তাদের পক্ষে আর ভারতবর্ষ শাসন করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯২০-তে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করা হয়েছিল রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে, কিন্তু গভীর অধ্যাত্মসাধনায় মগ্ন যোগী তাতে সম্মত হননি।

প্রসঙ্গত, আমরা জানি যে তারপর ১৯২১-এ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক এক স্বল্পপরিচিত অনাবাসী ভারতীয় এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেন এবং কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। যিনি চার বছর আগেই বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ দেখতে পান, তিনি কি ভারতের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা যুদ্ধের শীর্ষনেতার স্থান ইতিহাসে কোনো উচ্চতার হতে পারে তা বুঝতে পারেননি? নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এই মহাযোগী সবই বুঝেছিলেন কিন্তু সাময়িক খ্যাতির আকর্ষণ তাঁর ছিল না। তিনি তার অনেক আগেই সেসবের মায়া কাটিয়ে ভারতের চিরকালীন অন্তরাত্মার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

১৯৪০-এ চলে আসা যাক। সারা ইউরোপ জুড়ে তখন বর্ণবাদী নাৎসি বাহিনী তাণ্ডব করছে এবং বিশ্বজুড়ে তার ভয়ংকর আঁচ ছড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দিশিবিরে পুরে দেওয়া হচ্ছে, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে অকারণে মারা হচ্ছে। ওদিকে এই জাতিগত আধিপত্যের প্রভাব পড়ছে প্রাচ্যে, একটা অমানবিক চক্র গড়ে উঠছে হিটলারকে কেন্দ্র করে। আমরা দেখেছি রাজনীতি থেকে বহু দূরে সরে থাকা শ্রীঅরবিন্দ ভয়ানক উদ্বিগ্ন, তিনি ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক সাহায্য পাঠাচ্ছেন ফরাসি মিলিটারিকে (French Caisse de Defense Nationale) এবং ১০০০ টাকা সাহায্য পাঠাচ্ছেন ভারতের বড়োলাটের যুদ্ধকোষে। তিনি লিখছেন, ''আমরা মনে করি এই যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে বা বিশ্বব্যাপী জার্মানির নাৎসি মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলির রক্ষার্থে নয়, এটি সভ্যতাকে রক্ষা করা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে রক্ষার জন্য এবং অবশ্যই সারা পৃথিবীর মানবতাকে রক্ষা করার জন্য।''

১৯৪২-এ জাপান যোগ দেওয়ায় বিশ্বযুদ্ধের রূপরেখা পালটে গেল। সিঙ্গাপুরের পতন, মালায়ার পতন, বর্মাতে জাপানি সৈন্যদের দাপাদাপি এবং আসন্ন ভারত আক্রমণ ইংরেজদের মারাত্মক শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো। ভারতের নেতারাও তখন স্থির করতে পারছেন না তাঁরা কোনদিকে থাকবেন। একদিকে ইংরেজদের তাড়ানোর ইচ্ছে আর অন্যদিকে নাৎসিদের অধীনস্ত হওয়ার ভয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি ইংরেজ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠালেন ভারতকে স্বশাসনের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে যাতে ভারতীয়রা যুদ্ধে সহায়তা করেন। গভীর ধ্যান থেকে জেগে উঠলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি বুঝতে পারলেন ভারতকে অখণ্ড রাখার এটাই শেষ সুযোগ এবং এই প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয় তাহলে পরবর্তীকালে দেশের বিভাজন ঠেকানো অসম্ভব। ৩০ মার্চ ১৯৪২ স্যার ক্রিপস তাঁর প্রস্তাব পেশ করার পর ৩১ মার্চ পণ্ডিচেরী থেকে তাঁকে টেলিগ্রামবার্তা পাঠালেন শ্রীঅরবিন্দ, ''I welcome it as an opportunity given to India to determine for herself and organise in all liberty of choice her freedom and unity and take an effective place among the world's free nations. I hope that it will be accepted and the right use made of it putting aside all discords and divisions.'' (আমি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি কারণ ভারত তার ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণ করতে পারবে এবং নিজের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জোরে জগৎ সভায় নিজের স্থান নিশ্চিত করে নেবে। আমি আশা করবো সমস্ত তিক্ততা ও বিবাদ সরিয়ে রেখে এই প্রস্তাব গৃহীত হবে)।

শুধু এটুকু করেই থেমে থাকলেন না শ্রীঅরবিন্দ। পরদিন তাঁর আপ্তসহায়ক এস দুরাইস্বামীকে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠালেন দিল্লিতে কংগ্রেস কার্যকারিণীর সদস্যদের এবং হিন্দু মহাসভার নেতা ও শ্রীঅরবিন্দের পূর্বতন সহযোগী ডাঃ বি এস মুঞ্জের সঙ্গে কথা বলতে। তার পরদিন স্যার ক্রিপস শ্রীঅরবিন্দকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁর সক্রিয় সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এই প্রচেষ্টা বিফলে গেল। দুরাইস্বামীকে কটু কথা শুনে দিল্লি থেকে বিদায় নিতে হলো এবং কংগ্রেস স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলো। আর সেই সঙ্গে হারিয়ে গেল স্বাধীন অখণ্ড ভারতের স্বপ্নও। দুরাইস্বামীর সঙ্গে আরও একজন ভক্তকে পাঠিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, তাঁর নাম ইন্দ্র সেন। তিনি কংগ্রেসি নেতাদের মানসিকতা সম্পর্কে পরে লিখেছিলেন, ''আমরা এক এক করে সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং ওঁদের প্রতিক্রিয়া মোটামুটি একইরকমের ছিল : শ্রীঅরবিন্দ এই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তব পরিস্থিতি জানেন না, আমরা অনেক বেশি ভালো জানি।'' ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হয়েও কেন তিনি দুরাইস্বামীকে পাঠিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করায় শ্রীঅরবিন্দ পরে নিরাসক্তভাবে বলেছিলেন, ''একটু নিষ্কাম কর্মের জন্য''। বামপন্থীদের শুধু এটুকু মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে তারা যখন মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশভাগ করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন তখন ভারতমায়ের যোগী সন্তান শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু তাঁর প্রাণাধিক মাতৃভূমির অখণ্ডরূপ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শেষ চেষ্টা করছিলেন। তফাতটা এখানে। ■


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
**প্রণব**
পড়ুন ও পড়ান

# রামমন্দিরের রায়কে সম্মান জানানো প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য

শীর্ষ আদালতে রামমন্দিরের রায় বেরোনোর পর কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এতে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সাধুবাদ জানাই। যদিও কেউ কেউ এই রায়ে খুশি হননি, তথাপি কেউই অন্তর থেকে এর বিরোধিতা করেনি। এতে এটাই প্রমাণ হয়, রাম ভারতবর্ষের জাতীয় পুরুষ। তাই সবারই অন্তর থেকে মেনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। কোনো দেশের জাতীয়তাবোধকে সম্মান জানানো প্রত্যেক নাগরিকের শুভবুদ্ধির পরিচয় বহন করে। আর মানবে নাই বা কেন? কারণ বাবর তো এদেশে বহিরাগত আক্রমণকারী। সে এদেশে এসে শুধু মন্দির ভাঙেনি অনেক মন্দিরের চূড়া ভেঙে মসজিদের রূপ দিয়েছে। এদেশের হিন্দুদের মুসলমানে ধর্মান্তরিত করেছে একথা ঐতিহাসিক সত্য। পৃথ্বীরাজ চৌহান তরাইনের যুদ্ধে হারার আগে এদেশে মুসলমানদের নামগন্ধ ছিল না। একথা একজন মূর্খও জানে। মুসলমান আক্রমণকারী কুতুবউদ্দিন আইবক আসার পর দিল্লিতে সাতাশটি মন্দির ভেঙে ছিল। তৈরি করেছিল কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ। আজমিরে আড়াই দিন কা ঝোপড়া। এটা ঐতিহাসিক সত্য। এমন ইতিহাসকে যদি কেউ অস্বীকার করে তবে তার মতো মূর্খ ভারতে কেন পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এছাড়া পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার মন্দির যেগুলি ইসলামিক মসজিদ দ্বারা বেষ্টিত। এছাড়া আরও হাজার হাজার মন্দির রয়েছে যেগুলি অকাতরে ধ্বংস করা হয়েছে। সুলতান মামুদ মন্দির ধ্বংস আর হিন্দুদের সম্পদ লুটের জন্যই এসেছিল। সোমনাথ মন্দির এই মামুদই ১৭ বার লুট করেছিল। এছাড়া ধ্বংসকারী এবং হিন্দু হত্যাকারী চেঙ্গিস খাঁ, তার ইতিহাস কে না জানে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আসাদুদ্দিন ওয়াইসি আক্ষেপ করে বলেছেন, এবার হিন্দুদের টার্গেট হবে বিশ্বনাথের মন্দির ও মথুরার কৃষ্ণজন্মস্থান মন্দির। আমার প্রশ্ন, এতো এত মন্দির থাকতে আসাদ মিয়ার এ দুটির কথা মনে হলো কেন? আসাদ মিয়া এটা ভালোভাবেই জানেন তড়িঘড়ি এটা মনে হবার ব্যাপারটা। আসাদ মিয়া নিশ্চয় শুনেছেন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের বংশধর ইয়াকুব হাবিব উদ্দিন টুসি তার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্য করার জন্য সোনার ইট দিয়ে মন্দিরের ঘট স্থাপন করবেন।

**—স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

# ‘হে রাম’

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গান্ধীজীকে জাতির জনক বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত যে অন্তিম শব্দ তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সেটা ‘হে রাম’। আমার প্রশ্ন, ভারত পৃথিবীর মধ্যে একটি বহু প্রাচীন সুসভ্য জাতি। এই মহান দেশে গান্ধীজীর পূর্বে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা কেউই জাতির জনকের উপাধিতে ভূষিত হননি। দেশ এবং ভারতীয় জাতি গঠনে তাদের অবদানের তুলনায় গান্ধীজী খুব বেশি নন। ইতিমধ্যে তাঁর অপকর্মের ওপর এক ডজনের উপর বই প্রকাশিত হয়েছে। লেখকরা প্রত্যেকেই প্রথিতযশা লেখক এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত। এই বইগুলির লেখকদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত গান্ধীভক্তরা একটা মামলা দায়ের করার সাহস পাননি। জাতির জনকের অপকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে অবস্থানকালে শ্রীরামপুর গ্রামে জওহরলাল নেহরু এবং আচার্য কৃপালনীকে দেশভাগের সম্মতি দেওয়া, যার ফলস্বরূপ দেশভাগের প্রাক্কালে ২০ লক্ষ ভারতীয় নিহত হন। অসংখ্য মাতা ভগ্নী ধর্ষিত হয় এবং অসংখ্য মানুষ পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হয়। অথচ গান্ধী বলেছিলেন দেশ ভাগ হবে তার মৃতদেহের উপর দিয়ে। কিন্তু দেশভাগ হয়ে গেল আর গান্ধীজী জীবিতই রয়ে গেলেন! দ্বিতীয় প্রশ্ন, নাথুরাম গডসে যখন তাকে গুলি করে হত্যা

করেন তখন গান্ধীজী ‘উঃ’ শব্দ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এবং মোটেই ‘হে রাম’ বলেননি। এ বিষয়ে গবেষকদের মতামত আশা করি।

**—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

# বাগদাদি খতম

বিশ্ব মানবতার পয়লা নম্বর দুশমন তথা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক ও সিরিয়া (আই এস আই এস)-র মূল পাণ্ডা, সংগঠক, পরিচালক ও নির্দেশক এবং কট্টর জেহাদি আবুবকর আল বাগদাদি আজ নিহত। বিশ্বত্রাস বাগদাদি একদা ছিল আর এক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গি সংগঠন ‘আলকায়দা’র স্রষ্টা ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ২০১১ সালে মার্কিন নৌবাহিনী ‘সিলস্’-এর সশস্ত্র সেনারা অতি গোপনে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদের এক বাড়ির মধ্যে সপরিবারে বসবাসরত লাদেনকে খতম করে এক কাকভোরে। অথচ, সেই অভিযান (অপারেশন নেপচুন স্পিয়ার)-এর খবর ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি পাক প্রতিরক্ষা, সশস্ত্র ও গোয়েন্দা বাহিনী। ধরা পড়েনি ‘র‍্যাডার’এও। নির্বিঘ্ন সেই খতম-অভিযানের পর তখনকার ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ জঙ্গিপাণ্ডা লাদেনের লাশ ফেলে দেওয়া হয় গভীর সমুদ্রে। আলকায়দা এখন এক নখ-দন্তহীন নেকড়ের দলে পরিণত হয়েছে।

এক সময় আলকায়দার সঙ্গ ত্যাগ করে বাগদাদি ইরাক ও সিরিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে গড়ে তোলে ইসলামিক সাম্রাজ্য (ইসলামিক স্টেট)। ২০১৪ সালে সে নিজেকে ওই সাম্রাজ্যের ‘খলিফা’ রূপে ঘোষণা করে। আর সেই থেকে বিশ্বমানবতার শত্রু, ইসলামিক জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদের মাথা ও ধর্মোন্মাদ বাগদাদির খোঁজে নেমে পড়ে মার্কিন

সেনা ও গোয়েন্দা বাহিনী (সিআইএ)। একাজে তারা সাহায্য নেয় বিভিন্ন গুপ্তচর, সিরিয়ার কুর্দিশ বাহিনী, গোয়েন্দা ও বাগদাদি বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলির। তারাই সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল বাগদাদির গতিবিধির উপর। এছাড়াও সব শত্রুতা ও মতভেদ ভুলে ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া ও রাশিয়াও বাগদাদি নিধনে মার্কিন বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, যদিও তুরস্ক-সিরিয়া যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করছে আমেরিকা এবং সিরিয়াকে মদত দিচ্ছে রাশিয়া। একদা শিক্ষক বাগদাদি হয়েছে জেহাদি। অর্থাৎ সে কলম ফেলে হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। কিন্তু সে জানে না, কলম অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী। অস্ত্রের সাহায্যে দেশ জয় করা যায়, মানুষ হত্যা করা যায়, কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। মানুষের মন জয় করতে চাই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, মানবতা ইত্যাদি গুণাবলী। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে--- 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', 'তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' প্রভৃতি অমৃতবচন। কিন্তু কোরান বলছে 'জেহাদি'-র কথা। অর্থাৎ জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বীদের বিনাশ ঘটানো অথবা ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা। তাছাড়া কোরানে যে 'কাফের' কথার উল্লেখ রয়েছে তারা হচ্ছে ওই সব ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও মতাবলম্বী মানুষ বা অমুসলমান। এহেন 'কাফের' বা বিধর্মীরা ইসলামিক ফতোয়ায় বধযোগ্য, যদি না তারা ইসলামের শরণ নেয়। আবার মুসলমান হলেই ছাড় মিলবে না। কারণ যে সব মুসলমান হজরত মহম্মদকে শেষ নবি বলে স্বীকার করে না তারাও 'কাফের'। এই দলে রয়েছে শিয়া, আহমদিয়া, ইউসুফজাই, সুফি, কাদিয়ানি-সহ বহু সম্প্রদায়। এরা হজরত আলি (নবি মহম্মদের ভাগ্নে ও জামাতা)-র অনুগামী এবং তাঁকে শেষ নবি হিসেবে মানে। শিয়া অধ্যুষিত ইরান ছাড়া সব ইসলামিক দেশে এরা সরকারিভাবে সংখ্যালঘু রূপে ঘোষিত। আর মহম্মদকে যারা শেষ নবি রূপে স্বীকার করে তারা সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান। বিশ্বে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জেহাদি। এদের একটাই লক্ষ্য, কাফেরমুক্ত বিশ্বে 'খেলাফত' বা আল্লার শাসন কায়েম করা। কুখ্যাত জেহাদি লাদেন, বাগদাদি, তালেবান, হাফিজ সঈদ, সালাউদ্দিনরা সেই পথের প্রদর্শক।

জেহাদি লাদেনের নিধন হওয়ার পর স্বঘোষিত 'খলিফা' তথা জেহাদি ও আইএস-সুপ্রিমো বাগদাদির উত্থানে মধ্যপ্রাচ্য যখন অশান্ত ও সন্ত্রস্ত তখন থেকেই আমেরিকা বাগদাদি নিকেশের অস্ত্রে শান দিতে শুরু করে। পাষণ্ড বাগদাদির নৃশংস আইএস-বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। অগণিত প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়েছে। 'ধর্মগুরু' বাগদাদির একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বহু নারী ও বালিকা তার দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে। 'ধর্মগুরু' বটে! দীর্ঘ পাঁচ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নিরলস নজরদারি চালিয়ে সপার্ষদ মার্কিন সাঁড়াশি-আক্রমণে দিশেহারা বাগদাদি পালাতে ব্যর্থ হয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকে নিজেই উড়িয়ে দেয়। তার ছিন্নভিন্ন দেহও নিক্ষিপ্ত হয়েছে সমুদ্রে। লাদেনের পর বাগদাদি। অতঃপর কে?

**—ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

# এনআরসি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো বন্ধ হোক

প্রসঙ্গত, এনআরসি হলে কারা থাকবে, কারা থাকবে না সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র সরকার। এতে রাজ্য সরকারের মাধাব্যথার কোনো কারণই নেই বলে আমি মনে করি। নেহরু ও জিন্না এই দু' চাচা নেই, কিন্তু দেশভাগের কুফল আজও ভুগতে হচ্ছে। ওই দু' চাচাই হলে দেশভাগের মুলষড়যন্ত্রী।

আমার জানতে ইচ্ছে হয়, দেশ ভাগের কী প্রয়োজন ছিল? দেশ ভাগের এত বছর পরেও বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনদের সংখ্যা বাড়েনি। শুধু পাকিস্তানে নয় সমগ্র ইসলামিক দেশগুলিতে হিন্দুরা করুণ পরিস্থিতির শিকার। দেশ ভাগের পর হিন্দু ও মুসলমান যারা যে দেশে থেকে গেছেন তাঁদের তো চিন্তার কোনো কারণ নেই। অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে বেশিরভাগই হিন্দু ঘরবাড়ি ঘটিবাটি জমিজমা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে বেড়া টপকে চলে আসেন এমনকী ওই সম্পত্তি বিক্রি করতে দেয়নি ওখানকার কিছু উগ্র মৌলবাদীরা। তাঁদের যদি শরণার্থী তকমা দেওয়া হয় ক্ষতি কী? দিনহাটা তথা দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগঞ্জে গিয়ে একটু খোঁজখবর নিলে শ্যামল সেন, বীরেশ রায়, রবি গাইনদের মতো হিন্দু পরিবারগুলির দুঃখভরা কাহিনির কথা শোনা যাবে। রংপুরের বাসিন্দা স্কুলশিক্ষক শ্যামলবাবু তার মেয়েকে তাঁরই ছাত্র রশিদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। বীরেশ রায় তার সুন্দরী বউকে খুলনা জেলার ইউপি চ্যায়ারম্যানের চ্যালাদের হাত থেকে বাঁচাতে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এদেশে এসেছেন। এখানে তাঁরা এসে মানুষের বাড়িতে জন খাটছেন, তাদের কী করুণ পরিস্থিতি। ঠিক একইভাবে যদি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের মেয়ে বউ ও সম্পত্তির জন্য হিন্দুরা তাদের উপর অত্যাচার করত তাহলে মাকু সেকু তুণুর চ্যালা ও তাদের বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতি মিছিল থেকে পথ অবরোধ এবং প্রশাসনকে ঘন ঘন ডেপুটেশন কত কী যে করত তার ঠিক নেই। কারণ মোল্লাদের তোল্লা দেওয়াই এদের প্রধান কাজ। এরাই দেখুন এনআরসি নিয়ে খুবই চিন্তিত।

অতএব মমতা ব্যানার্জির কাছে আবেদন, ঘাবড়াবেন না, এনআরসি-তে আমার যদি অনুপ্রবেশের তকমা মেলে এবং তালিকায় নাম ওঠে তাহলে বাংলাদেশ চলে যাবো, এতে ভয় কীসের? শেখ হাসিনা তো মমতা ব্যানার্জির দিদি এবং বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবুর রহমানকে ভারতই সহযোগিতা করেছিল। সুতরাং এই সময়ে তাঁর কন্যা অবশ্যই হাত বাড়াবেন। সুতরাং এনআরসি-তে কোনো ভয়ের কারণ নেই। রাজ্য সরকার মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোটব্যাঙ্কের ফয়দা নিচ্ছে। সবশেষে বলি, পশ্চিমবঙ্গের কিছুসংখ্যক হিন্দু আছেন যারা দু'পাতের এঁটো চাটতে পছন্দ করেন।

**—রাজু সরখেল,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

# তলোয়ারবাজিতে মেয়ে গুরু আর মা শিষ্যা

অঙ্গনা

**সুতপা বসাক ভড়**

কিছু আশ্চর্যজনক সত্য ঘটনা আমাদের একসঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দে অভিভূত করে তোলে। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে হরিয়ানার জিন্দে। মাত্র এগারো বছরের মেয়ে কনুপ্রিয়া যখন প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করল, তখন মা লাভলি চাওলা তলোয়ারবাজিতে রাজ্যস্তরে পদকের পর পদক জিতে ঘরে নিয়ে এল। এখন লাভলির লক্ষ্য হলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা। হরিয়ানার জিন্দের মেয়ে কনুপ্রিয়া ও লাভলিকে এখন সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

চল্লিশ বর্ষীয়া গৃহিণী লাভলি চাওলা বর্তমানে তলোয়ারবাজির রাজ্যস্তরীয় খেলোয়াড়। এখন তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিজয়ী হবার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছেন।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চান্সেলর ড. এ.কে. চাওলার পুত্রবধূ লাভলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী। কিছুদিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। বিয়ের পর গৃহিণী এবং তারপর কন্যা প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বিকেলবেলা নিজের এগারো বছরের মেয়ে কনুপ্রিয়াকে তলোয়ার শেখাতে নিয়ে যেতেন। মেয়েকে আরও বেশি উৎসাহ দেবার জন্য নিজেই মেয়ের সঙ্গে খেলার অভ্যাস করতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল মেয়েকে ভালোভাবে অভ্যাস করানো। দেখতে দেখতে মেয়ে যে কখন মা'র প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করল— তা কেউই তখন বুঝতে পারেনি। সম্প্রতি কৈথলে হরিয়ানার স্টেট মাস্টার্স ফেন্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপে লাভলি দুটি স্বর্ণপদক এবং চারটি অন্য পদক জিতে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর মেয়ে তাঁকে তলোয়ারবাজিতে বাস্তবিকভাবেই দক্ষ খেলোয়াড় বানিয়ে দিয়েছে।

লাভলি জানান যে, তাঁর মেয়ে কনুপ্রিয়ার তলোয়ার চালানো শেখার খুব সখ। তিন বছর আগে সে অস্ত্র চালনা শিখতে শুরু করে। তাকে প্রত্যেকদিন বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। মেয়েকে নিয়ে যাতায়াতের দায়িত্ব প্রায়শই মা লাভলির ওপর আসত। একদিন কনুপ্রিয়া মাকে তার সঙ্গে খেলতে বলে। তখন থেকেই মা ও মেয়ে খেলতে শুরু করে। কনুপ্রিয়া ন্যাশনাল স্কুল স্টেটে স্বর্ণপদক, আন্ডার-১৪ ন্যাশনালে রৌপ্যপদক, আন্ডার-১২ স্টেট-এ স্বর্ণপদক এবং আন্ডার-২০-তে জেলা স্তরে শংসা পদক জিতেছে।

লাভলি জানায় যে, হরিয়ানা ফেন্সিং ফেডারেশন যখন মাস্টার্স প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে, তখন মেয়ে মাকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বলে। মাকে অনুপ্রেরণা দেয় মেয়ে। যেদিন তার মা তার সঙ্গে অভ্যাস করতে আসতেন, সেদিন উৎসাহ দিয়ে কনুপ্রিয়া বলত, "তুমিও জিততে পারো..."। এরসঙ্গে মেয়ের প্রশিক্ষকও তাকে উৎসাহ দিলে লাভলি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত কৈথলে হরিয়ানা স্টেট ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং গ্রুপ ইভেন্টে দুটি স্বর্ণপদক এবং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় দুটি রৌপ্যপদক জিতে নেন।

উচ্ছ্বসিত লাভলি বলে ওঠেন, এই প্রতিযোগিতায় মেয়ে কনুপ্রিয়াই তাঁর প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। মার খেলার সময় বাইরে বসে সে নির্দেশ দিয়েছে, 'এগিয়ে যাও...', 'সোজাসুজি মারো...', 'এবার এইরকম করো...' ইত্যাদি।

মাস্টার্স ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে লাভলি চাওলার উৎসাহ অনেক বেড়ে গেছে। সেজন্য তিনি মেয়ের সঙ্গে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই খেলায় দেশের নামোজ্জ্বল করার পরিকল্পনা করেছেন। লাভলির প্রশিক্ষক বীণা সৈনী তাঁকে সাহায্য করছেন। তাঁর সাফল্যে ড. এ.কে. চাওলা, মা ঊষা, স্বামী গুঞ্জন চাওলা খুবই আনন্দিত। এঁরা প্রত্যেকেই লাভলি ও কনুপ্রিয়ার উভয়েরই আরও সাফল্য কামনা করছেন।

একই ক্ষমতার সিঁড়িতে মা ও মেয়ের এইরকম যুগলবন্দি একটি বিরল ঘটনা। মেয়ের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ নিজের সুবর্ণময় কেরিয়ার বিসর্জন, অপরদিকে সেই মেয়েই মাকে অনুপ্রাণিত করে, উৎসাহ দিয়ে নতুন পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার ফলে আজ দুজনেই সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে চলেছেন। অভিনন্দন কনুপ্রিয়া ও লাভলি চাওলাকে! ■

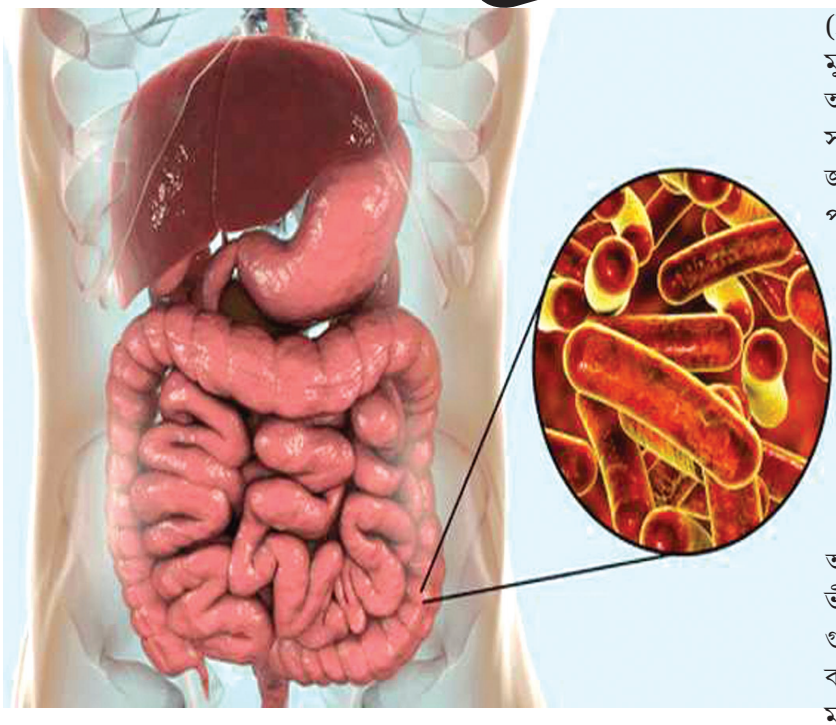

# পেটের অসুখে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

**ডাঃ সমরজিত ঘটক**

বৃহদন্ত্রের দুটি অসুখ আমাদের রাজ্যে খুব দেখা যায়—

(১) **আমাশা :** দুরকম অ্যামিবিক এবং ব্যসিলারি ডিসেন্ট্রি। প্রথমটিতে পেটে যন্ত্রণা, বেশি কোঁথ ভাব, মলের সঙ্গে কফের মতো মিউকাস থাকা বা পাতলা পায়খানা হয়। কিছু ক্ষেত্রে লিভারে ফোঁড়া হতে পারে। দ্বিতীয়টি (ব্যসিলারি ডিসেন্ট্রি) বেশি বিপজ্জনক— মলের সঙ্গে রক্ত পড়া, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। দুটি রোগই জীবাণু ঘটিত এবং মলের পরীক্ষা করে নিশ্চিত ধরা পড়ে। এই রোগ দুটি ফিকো-ওরাল রুট দ্বারা ছড়ায়, যেমন অপরিষ্কার বাসনে বা হাতে খাবার খাওয়া ও পরিবেশন করা, সংক্রামিত জল পান করা, এছাড়া মাছির দ্বারা খাবারে জীবাণু ছড়িয়ে যাওয়া। আয়ুর্বেদে এই রোগকে অতিসার বা প্রবাহিকা বলা হয়।

**চিকিৎসা :** দুটি রোগই আয়ুর্বেদে নির্মূল করা সম্ভব। প্রথম হলো নিদান বর্জন অর্থাৎ উপরে বলা যে কারণে রোগ ছড়ায় তা প্রতিহত করা। বেশি পটি হলে ওআরএস খেতে হবে। গ্রামে জল ফুটিয়ে খাওয়া ভালো। ওষুধের মধ্যে কুটজ, মুথা, দাড়িম এসব ভেষজ থেকে তৈরি ওষুধ, যশদ ভস্ম, সঞ্জীবনী বটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। শিশুদের জন্য আমিডিও সিরাপ পাওয়া যায়। তবে পাশ করা আয়ুর্বেদ ডাক্তার দেখান, কারণ সব ওষুধ সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।

(২) **কোলাইটিস :** রোগের লক্ষণ অনেকটা আমাশার মতো, এই রোগে বৃহদন্ত্রের প্রদাহ হয়। সারাদিনে ২০ বার পর্যন্ত পায়খানা হতে পারে, পায়খানার সঙ্গে রক্ত ক্ষরণ হয়। আনুষঙ্গিক সমস্যা হিসাবে অস্থিসন্ধিতে বাতের মতো ব্যথা, রক্তাল্পতা থাকতে পারে, রক্তে ইএসআর বাড়তে পারে। আই বি এস (Irritable bowel syndrome) মূলত মানসিক কারণে হয়। এক্ষেত্রে আবেগজনিত কারণে বৃহৎঅন্ত্র সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, সামান্য বায়ু জমলেও ব্যথা অনুভূত হয়। যেমন পরীক্ষার চাপে বা ইন্টারভিউ এর আগে পেট ব্যথা (ভয়জ অতিসার)। কোলোনস্কপি পরীক্ষা দ্বারা রোগ দুটি নিশ্চিত করা যায়। আই বি এস-এ মেধ্য ওষুধ, শিরোধারা প্রযোজ্য। কোলাইটিসে বৃহৎ অন্ত্রে পিত্তের প্রকোপ হয় এবং ধাতুপাক (Tissue damage) হয়।

পিচ্ছাবস্তি নামক পঞ্চকর্ম থেরাপি অন্ত্রের প্রদাহ ও ঘা নিরাময় করতে ভীষণ কার্যকরী। ওষুধের মধ্যে গুড়ুচ্যাদি, চন্দন- উসিরাদি, মহা-তিক্তক বর্গের ভেষজ, বোল পর্পটি, লাক্ষা, মধুকা ব্যবহৃত হয়। বেশ কয়েক মাস ওষুধ খেতে হবে। খাদ্য খাবার খুব নিয়ম মেনে খেতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর আয়ুর্বেদ ডাক্তারের কাছে ফলোআপ করতে হবে।

ক্রনিক ডাইরিয়াতে আজকাল প্রোবাওটিক দেওয়া হয়। আয়ুর্বেদে সেই প্রাচীনকালেই তক্র ও তক্রারিস্ট (বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ঘোল বা ছাঁচ) দেবার কথা বলা আছে। এই কারণে আমাশার মতো উপসর্গ বেশিদিন থাকলে পাশ করা আয়ুর্বেদ ডাক্তারের পরামর্শ নিন, বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ খাবেন না।

তাছাড়া কোলাইটিসে কিছু ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করতে হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খাঁটি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুধুমাত্র প্রাইভেট ক্লিনিক বা রাজধানী শহর কলকাতাতেই নয়, গ্রামবাংলাতেও পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের ২০০ গ্রামীণ সদর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়ুর্বেদ মেডিকেল অফিসারদের দিয়ে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। ■

# বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিতাড়নের নতুন কৌশল

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥** সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন, বাড়িঘর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার নতুন কৌশল ফেসবুক হ্যাক করে ইসলাম ধর্ম ও নবি সম্পর্কে কটূক্তি প্রচার। স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে কোনো হিন্দু সমাজের নিরীহ মানুষের ওপরেই দায়টা চাপে। আর কৌশলী মুসলমান উগ্রবাদীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বশক্তি নিয়ে। উদ্দেশ্য সংখ্যালঘুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের জায়গাজমি দখল ও সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেওয়া। কয়েক বছর ধরেই এই কৌশলটা কাজে লাগানো হচ্ছে। সংখ্যালঘু নেতারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন বারবার। তবে সম্প্রতি ভোলায় এই ধরনের ঘটনায় কৌশলটা নজরে এসেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। গত ২০ অক্টোবর এই ঘটনা ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একজন মুসলমান হয়ে কীভাবে মহানবি (সা.) সম্পর্কে খারাপ কথা লিখে অন্যকে ফাঁসায়, তা বোধগম্য নয়। ভোলায় একটি হিন্দু ছেলের ফেসবুক আইডি হ্যাক করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মানুষকে সমবেত করার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল? প্রধানমন্ত্রী গণভবনে এক বৈঠকে বলেন, বোরহানউদ্দিনে এক হিন্দু ছেলের ফেসবুক আই ডি হ্যাক করে সেখানে তার নাম দিয়ে মহানবির বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করা হয়। যার ফেসবুক হ্যাক করা হয়, তাকে আবার ফোন করে ২০ হাজার টাকাও দাবি করা হয়। বলা হয়, টাকা না দিলে তার আইডিতে এমন সব কথা লিখবে, যাতে তার ক্ষতি হবে। এটি জানার পর ওই হিন্দু ছেলে থানায় গিয়ে জিডি করে। কিন্তু জিডি করা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে যে টেলিফোনটি করেছিল তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে। ফেসবুকে যে এই হিন্দু ছেলেটির আইডি হ্যাক করে টাকা না পেয়ে তার নামে বাজে কথাগুলো লিখেছে সেও তো একজন মুসলমান।

ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার ঈদগা মাঠে কথিত 'সাধারণ তৌহিদী জনতা'র বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৪ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়। অভিযোগ উঠেছিল, ১৮ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্য শুভ নামে এক যুবকের ফেসবুক আইডি থেকে তার বন্ধু তালিকার বেশ কয়েকজনের কাছে ইসলাম ধর্ম ও মহানবি (সা.)-কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মেসেজ আসে। বিপ্লব বোরহানউদ্দিন উপজেলার কাঁচিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের চন্দ্রমোহন বৈদ্যের ছেলে। পরে কয়েকটি আইডি থেকে ফেসবুকে প্রতিবাদ জানালে বিষয়টি সবার নজরে আসে। এ অবস্থায় ওইদিনই সন্ধ্যায় বিপ্লব বোরহানউদ্দিন থানায় আইডি হ্যাক হয়েছে বলে জিডি করতে এলে পুলিশ বিষয়টি তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে

পুলিশি হেফাজতে রেখে দেয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ এক হ্যাকারকে আটক করে। ফেসবুকে মেসেজটি ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা ওই মেসেজ প্রদানকারী হিসেবে বিপ্লবকে চিহ্নিত করে তার শাস্তির দাবিতে বোরহানউদ্দিন ঈদগা মাঠে সাধারণ তৌহিদি জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। প্রশাসন বোরহানউদ্দিন মসজিদের ইমাম মাওলানা জালালউদ্দিন ও বাজার মসজিদের ইমাম মাওলানা নিজামকে অনুরোধ জানালে এই দুই ইমাম সকাল ১০টায় দোয়া- মোনাজারের মাধ্যমে বিক্ষোভ মিছিলটি সমাপ্ত করেন। কিন্তু ততক্ষণে বোরহানউদ্দিনের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক এসে ইদগাহ ময়দানে জড়ো হয়। এক সময় তারা ওই দুই ইমাম এবং সেখানে থাকা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে মসজিদের ইমামের কক্ষে আশ্রয় নেয়। উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পুলিশ নিজেদের বাঁচানোর জন্য মুসলমানদের ওপর ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এতে মুসলমানরা আরও উত্তেজিত হয়ে কক্ষের জানালা ভেঙে পুলিশের উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে ও উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায়, ৪ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। সহিংস বিক্ষোভ ও পুলিশের গুলির ঘটনার কিছু পরই সেখানকার হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মন্দির এবং বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়। রবীন্দ্রপল্লীর ভাওয়াল বাড়ি এলাকায় শুরুতে বাজারে এক হিন্দু ভদ্রলোকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। এরপর সেখানকার একটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে সব প্রতিমা ভেঙে ফেলে হামলাকারীরা। একই এলাকার ৮টি হিন্দু বাড়িতে হামলা লুটপাট ও ২টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, একজন মুসলমান হয়ে কীভাবে নবি করিম (সা.)-কে নিয়ে এই ধরনের বাজে কথা লেখে? সেই কথার রেশ ধরে সেখানকার একজন পির সাহেব বেশকিছু লোককে জড়ো করেন। পুলিশ তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলে তারা পুলিশের উপর চড়াও হয়। এখন দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে নানা ধরনের অপপ্রচার ছড়ানো হচ্ছে। অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। তাহলে এরা কারা? আর এদের উদ্দেশ্যটাই বা কী?

শেখ হাসিনা বলেন, কেউ যদি সত্যিকার ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে, যদি তাদের নবি করিম (সা.)-এর প্রতি এতটুকু সম্মান থাকে, তাহলে আরেকজনের ক্ষতি করার জন্য এই ধরনের জঘন্য কথা কীভাবে লেখে? কাজেই আমি দেশবাসীকে বলব ধৈর্য ধরতে। যারা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে চায়, তাদেরও খুঁজে বের করা হবে। এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, একটি মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দেশে একটি অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। দেশ যখন ভালোভাবে চলছে, অগ্রগতি হচ্ছে, তখনই একটি শ্রেণী নানাভাবে একটি অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। কেউ যদি আমাদের মহানবি (সা.) বিরুদ্ধে কিছু লিখে থাকে, নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যার যার ধর্ম তার তার কাছে। কাজেই সব ধর্মের মানুষ এই দেশে সমঅধিকারে সম্মানের সঙ্গে বাস করবে। এটাই মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার এবং বাংলাদেশ যেন একটি শান্তি পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে উঠে আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। (ইত্তেফাক ২১।১০।১৯)

ফেসবুকে হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর নামে ইসলাম ধর্ম ও মহানবি (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির উগ্র সাম্প্রদায়িক মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচারে হামলা, বাড়িঘরে আগুন দেওয়া, মন্দিরে প্রতিমা ভাঙা, আগুন দেওয়া, হতে বৃদ্ধা নারীদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন, ধর্ষণ, দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠন-জ্বালিয়ে দেওয়া জমি দখল এবং সর্বোপরি তাদের ভিটে ছাড়া করে বাংলাদেশকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু শূন্য করার নীল নকশার একটি মোক্ষম অস্ত্র।

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার রামুতে, ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর পাবনা জেলার সাঁথিয়ায়, ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার মোহনায়, ২০১৬ সালের ২৯ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জোলার নাসিরনগরে, ২০১৭ সালের ১০ নভেম্বর রংপুর জেলার গঙ্গাচড়ায় এবং সম্প্রতি গত ২০ অক্টোবর ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়।

সবচেয়ে বড়ো কথা, সংখ্যালঘুদের ওপর এই কৌশলে হামলার সময় কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। এমনকী আওয়ামি লিগকেও নয়। বরং হামলা সংগঠিত করতে কখনো প্রত্যক্ষ ও কখনো পরোক্ষভাবে দলমতনির্বিশেষে সব নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়। এর মধ্যে মন্ত্রী-সাংসদদেরও দেখা যায়। ভোলার ঘটনায় খোদ পুলিশ কর্মকর্তারাই বলেছেন, উগ্র ইসলামি শক্তি যখন সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করে তখন রাজনৈতিক নেতাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানিয়েও কাউকে পাওয়া যায়নি। এমনকী স্থানীয় আওয়ামি লিগ সাংসদও আসেননি। তিনি মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখেন। এই প্রেক্ষাপটে অতীতের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

**রামু (কক্সবাজার)**

ফেসবুকে উত্তম বড়ুয়া নামে এক যুবক কোরান শরীফ অবমাননা করে মন্তব্য করেছে এই গুজব ছড়িয়ে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাসহ কক্সবাজার সদর, টেকনাফ ও উখিয়ায় উগ্র ইসলামপন্থীদের একাধিক দল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শত বছরের পুরনো ১২টি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরে অগ্নি সংযোগ করে এবং বৌদ্ধদের ৪৫টির মতো বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ভাঙচুর করে শতাধিক ঘরবাড়িতে। সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি হয় রামুর সদর ইউনিয়নে। এতে আশেপাশের কয়েকটি ইউনিয়ন থেকে ট্রাকে করে কয়েক হাজার জঙ্গি মুসলমান প্রথমে রাত সাড়ে ১১টার সময় এক জায়গায় সমবেত হয়। রাত ১২টার পর সঙ্ঘবদ্ধ লোকজন বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। এই ঘটনার উস্কানিদাতা ও হামলায় নেতৃত্বদানকারী

হিসেবে একই সঙ্গে স্থানীয় জামায়াত, বিএনপি ও ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের নেতা কর্মীদের ভূমিকার তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যানুসন্ধানে আরও দেখা যায়, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা থেকেই যখন সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতারা সভা ও মিছিল করছিল তখন স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ধ্বংসলীলা ভয়াবহ আকার ধারণ করে তখন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কিংবা ব্যাপকতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেও ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সরকার ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু নতুন মন্দির হয়েছে সত্যি, কারও কারও মতে তা পূর্বের চেয়ে দৃষ্টিনন্দনও বলা চলে। তবে শত শত বছরের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংগ্রহ লুটপাট হয়ে যাবার বেদনা ভুলবার নয়। ৭ বছরে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও এলাকায় আতঙ্ক এখনও কাটেনি। বিশেষ করে চিহ্নিত হামলাকারীদের মধ্যে বেশির ভাগেরই মামলার চার্জশিটে নাম নেই অথবা জামিন নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফেসবুকে ইসলামবিরোধী মন্তব্যের মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত উত্তম বড়ুয়া হামলার রাত হতে আজও নিখোঁজ। পরে প্রমাণিত হয়েছে, ফেসবুকে ইসলামবিরোধী মন্তব্য উত্তমের ছিল না। তার ফেসবুক হ্যাক করা হয়। উত্তমের স্ত্রী ঋতু বড়ুয়া বলেন, ফিরে আসবে কিনা জানি না, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করত এতদিনে, অন্তত ছেলেটিকে দেখতে নিশ্চয়ই আসত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটির ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। ৯ বছরের ছেলে আদিত্যর শিশু মনটিও আশা করে থাকে বাবা কবে আসবে, আদর করবে? সাত বছর পার হলেও ওই ঘটনায় দায়ের করা ১৮টি মামলার একটিরও বিচার সম্পন্ন হয়নি । প্রভাবশালী আসামিরা জামিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্যে। তাদের ভয়ে মামলার সাক্ষীরা আদালতের চৌকাঠ মাড়াতেও সাহস পায় না।

বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্যের বাবা-মা।

**সংখ্যালঘুদের ওপর এই কৌশলে হামলার সময় কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। এমনকী আওয়ামি লিগকেও নয়। বরং হামলা সংগঠিত করতে কখনো প্রত্যক্ষ ও কখনো পরোক্ষভাবে দলমতনির্বিশেষে সব নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায়।**

**সাঁথিয়া (পাবনা)**

রামুর ঘটনার ১ বছর পর ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ এনে পাবনার সাঁথিয়ার বনগ্রামে হিন্দুপল্লীতে হামলা চালানো হয়। ঘটনার দিন এলাকায় ত্রিমুখী হামলা হয়। এক দল বাজারে মিছিল বের করে, আরেক দল পাবনা-নগরবাড়ি সড়কে কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দেয়, অন্য আরেক দল লাঠিসোটা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে হিন্দু বাড়ি ও মন্দিরগুলোতে হামলা চালায়। সাঁথিয়া উপজেলার বনগ্রামে বাজারের স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবুল সাহার একমাত্র ছেলে রাজীব সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এই বলে যে, রাজীব তার ফেসবুকে ইসলামের কটূক্তি করে পোস্ট দিয়েছে এবং এই মিথ্যে স্ট্যাটাসের শতশত ফটোকপি বিলিয়ে সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করে তোলা হয়। অভিযুক্ত রাজীব সাহা তখন স্থানীয় স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

উল্লেখ্য, পরবর্তীতে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় রাজীবের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ, কিন্তু অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত না হওয়ায় এমনকী পুলিশের তদন্তেও বেরিয়ে আসে যে রাজীব এরকম কোনো পোস্ট দেয়নি। ফলে মিথ্যে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পায় রাজীব। তবে কে বা কারা ওই পোস্ট দিয়েছিল তা আজও সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। রাজীব বা হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ এই মিথ্যে ধর্মীয় অবমাননার জন্য দায়ী না হলেও সেদিন গুজব ছড়িয়ে উস্কানি দিয়ে হাজার হাজার লোকজন সাহাপাড়া-সহ এলাকার ৩০/৩৫টি হিন্দু বাড়িতে ভাঙচুর এবং লুটপাট করে। বাজারে কালী মন্দির ও বাবুল সাহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাট চালায়। বাবুল সাহার বসত বাড়ি ভাঙচুর করে, পারিবারিক প্রতিমা ভাঙচুর করে তাতে আগুন দেয়।

ওই দিনের ঘটনায় আটক ও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সবাই বর্তমানে জামিনে

রয়েছে এবং দায়েরকৃত তিনটি মামলার একটিরও বিচার সম্পন্ন হয়নি আজও। বনগ্রাম বাজারে নিজের দোকানে বসে বাবুল সাহা সম্প্রতি বলেন, এতদিন হয়ে গেল, কই কিছুই তো হলো না। পুলিশ বলে সাক্ষ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিচার শেষ হবে না। সাক্ষীরা কেউ ভয়ে নামও বলতে চান না এবং সাক্ষ্য দিতেও সাহস পান না। বিচারও হয় না।

**হোমনা (কুমিল্লা)**

পাবনার ঘটনার ৬ মাস যেতে না যেতেই একই কায়দায় আবারও ফেসবুকে ইসলামের নবিকে কটাক্ষ করার মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার সীমান্তবর্তী বাঘসীতারামপুর হিন্দু প্রধান গ্রামে বাড়িঘর ও মন্দির ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। হামলায় মূলত পাশের উপজেলা মুরাদনগরের পাঁচকিপটা গ্রামের বাসিন্দাদের একত্রিত করে বাঘসীতারামপুরের হিন্দু বাড়িগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। হোমনা থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলাম শিকদার বলেন, দুই হিন্দু যুবক মহানবি (সা.)-কে কটাক্ষ করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে, এমন গুজব রটিয়ে পাঁচকিপটা গ্রামের কয়েকশো মুসলমান বাঘসীতারামপুর গ্রামের হিন্দু পল্লীতে হামলা চালিয়ে ২৮টি পরিবারের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার ঘটনার গুজবে নাম আসায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই তরুণ উৎসব দাস, শ্রীনিবাস দাসকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে ওই ধরনের কোনো পোস্ট উৎসব বা শ্রীনিবাস দেয়নি।

**নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)**

হোমনার পর ফেসবুক নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার পর ২০১৪ সালের ২৯ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার হরিণবেড় গ্রামের রসরাজ দাস নামে জেলে পরিবারের এক নিরক্ষর যুবক ফেসবুকে পবিত্র কাবাঘর অবমাননা করেছে এই অভিযোগে তাকে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় একদল মুসলমান যুবক। এলাকায় মাইকে প্রচার করে নাসিরনগর উপজেলা সদরে পরদিন ৩০ অক্টোবর প্রতিবাদ সমাবেশ আহ্বান করা হয়। ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টার দিকে নাসিরনগর উপজেলা সদরে 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত' এবং 'তৌহিদি জনতা' ব্যানারে পৃথক পৃথক দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবেশে স্থানীয় আওয়ামি লিগের নেতাকর্মীরা অংশ নিয়েছিল। ১৩ কিলোমিটার দূরের হরিপুর ইউনিয়ন থেকে ১৪-১৫টি ট্রাক ভরে মুসলমান যুবকদের নিয়ে আসার পর হামলা হয় নাসিরনগরের হিন্দু পল্লীতে। তথ্য পাওয়া যায়, ট্রাক ভরে মুসলমান যুবকদের নিয়ে আসার পর হামলা হয় নাসিরনগরের হিন্দু পল্লীতে। এই তথ্যও পাওয়া যায়, যেসব ট্রাক ও ট্রাক্টরে চড়ে হামলাকারীরা এসেছিল সেগুলোর ব্যবস্থা ও অর্থের জোগান দেন আওয়ামি লিগ দলীয় স্থানীয় চেয়ারম্যান দেওয়ান আতিকুর রহমান। এরপর সমাবেশস্থল থেকে ৮টি হিন্দু পাড়ায় অন্তত ৩০০টি বাড়ি ও ১০টি মন্দিরে ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানো হয়। এ ঘটনায় ৮টি মামলা হয় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও পুলিশের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত একটি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করতে পেরেছে পুলিশ। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী রসরাজ দাসের মোবাইল থেকে কাবাঘর অবমাননার ছবি আপলোডের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফরেনসিক রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার পর আদালত রসরাজকে অন্তবর্তীকালে জামিন মঞ্জুর করে। জামিন পেয়ে রসরাজ বলেছিলেন, ফেসবুক কী তিনি তা জানেন না, ফেসবুক চালাতেও জানেন না। পাসওয়ার্ড কাকে বলে তারও কোনো ধারণা নেই তার। যে পোস্টটি ঘিরে এই তাণ্ডব সেটি পরে আর পাওয়া যায়নি।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১৪ সালের নভেম্বরের ৪ তারিখ আবারও একদফা হামলা হয় নাসিরনগরে হিন্দুদের ওপর। গভীর রাতে অন্তত ৬টি হিন্দু বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় ও জেলার একাংশের আওয়ামি লিগ নেতাদের উস্কানির অভিযোগ ছিল। এ ঘটনার পেছনে স্থানীয় এমপি ও সরকারের তখনকার মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী প্রয়াত ছয়েদুল হকের হাত ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভও হয়। এত বছর পরও ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা হয় বিচারের আওতায় আসেনি অথবা দু'একজন বাদে সবাই জামিন নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ভুক্তভোগীরা জানান, ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনও বুক কাঁপে তাদের। চোখের সামনে নিজের ঘর ভাঙচুর-লুটপাট হতে দেখেছেন সবাই। এলাকার একটি মন্দিরও হামলার হাত থেকে রক্ষা পায়নি, সব ভেঙে দেওয়া হয়। অনেকেই মোবাইলে

*পুলিশি হেফাজতে বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্য।*

ভিডিও করে রেখেছিলেন। তারপরও জড়িতদের অনেককে আইনের আওতায় আনা হয়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি আদেশ চন্দ্র দেব জানান, ভিডিও চিত্রে যাদের ছবি আছে তাদের অনেকেই এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রায় সবাই জেল থেকে জামিনে বের হয়ে গেছে।

**গঙ্গাচড়া (রংপুর)**

নাসিরনগরে হামলার এক বছর পর একই অভিযোগ, ফেসবুকে মহনবি (সা.)-কে অবমাননা করা হয়েছে— এমন পোস্ট শেয়ারের অভিযোগ তুলে ২০১৭ সালের ১০ নভেম্বর রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ও সদর উপজেলার সীমানায় অবস্থিত ঠাকুরপাড়ায় হামলা চালিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫টি বাড়িঘর ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালে স্থানীয় চা দোকানদার আলমগির হোসেন (২৮) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। উল্লেখ্য, ঘটনার ৪ দিন আগে ৬ নভেম্বর স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী রাজু মিয়া বাদী হয়ে আইসিটি আইনে ঠাকুরপাড়ার টিটু রায়ের বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে গঙ্গাচড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশের রংপুর রেঞ্জের তদানীন্তন ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক জানান, যার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ তোলা হচ্ছে সেই টিটু রায়ের বাড়ি গঙ্গাচড়ার ঠাকুরপাড়া গ্রামে হলেও তিনি সেখানে থাকেন না। নারায়ণগঞ্জে বসবাস করেন। স্থানীয় জনগণ বলেন, টিটু রায় দীর্ঘ ৭ বছর যাবত দেনার দায়ে পরিবার পরিজন নিয়ে এলাকা ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে কোনো এক পোশাক কারখানায় কাজ করেন। টিটু রায়ের স্বজনদের দাবি, তিনি লেখাপড়া জানেন না। সংবাদমাধ্যমে আরও যে ভয়ংকর তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে তাহলো টিটু রায়ের ছবি ব্যবহার করে যে ফেসবুক আইডি থেকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে সেখানে ইংরেজিতে টিটু রায় না লিখে মোহম্মদ টিটু (এমডি টিটু) লেখা ছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, হাজার হাজার মানুষ সবাই কি পোস্ট দেখেন নাকি একটি বিশেষ মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষগুলোকে বারবারই ধর্ম অবমাননার কথা বলে উস্কে দিচ্ছে। টিটু রায়ের কথিত ফেসবুক পোস্টটি নিয়ে ক'দিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ আসামিকে ধরা হবে বলে কথা দেন। ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক আরও বলেন, শুক্রবার জুমার নামাজের পর হঠাৎ স্থানীয় কিছু মানুষ বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। একটি মিছিলের বড়ো অংশ গিয়ে হিন্দু পাড়ায় আক্রমণ করে। দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা পুলিশ তাদের বাধা দেয়। বাধা না মেনে যখন তারা হামলা চালায় বাড়িঘরে আগুন দেয় তখন পুলিশ শটগানের গুলি চালায় এবং পুলিশের গুলিতে একজন নিহত কয়েকজন আহত হন। এরপর পার্শ্ববর্তী হরিয়ালকুঠি, মোমিনপুর, শলেয়াশাহ ইউনিয়নে ৩ দিন ধরে প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ ও মাইকিং করে লোক জড়ো করা হয় এবং সেখান থেকে কয়েক হাজার মানুষ রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী ঠাকুরপাড়ার দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ বাধা দিলে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে যাবার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালায়, লুটপাট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় কয়েকজন তাদের বাধা দিতে আসলে তারাও নির্যাতনের শিকার হয়। হামলার এ ঘটনায় ফজলার রহমান নামে রংপুর জেলা পরিষদে কর্মরত একজন প্রকৌশলীর প্রত্যক্ষ মদতের তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া স্থানীয় বিএনপি ও জামাত শিবির নেতা কর্মীদের সম্পৃক্ততার অভিযোগও ওঠে। ঘটনায় গঙ্গাচড়া ও কোতয়ালী থানায় দুটি মামলা হয়। কথিত ফেসবুক পোস্ট দেওয়ায় অভিযুক্ত টিটু রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার পরপরই রংপুর জেলা পরিষদের প্রকৌশলী আত্মগোপন করেন। ২১ ডিসেম্বর ঢাকার শ্যামলী থেকে ফজলার রহমানকে গ্রেপ্তার করে রংপুরে নিয়ে আসা হলে এবং ২৪ ডিসেম্বর তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। সংখ্যালঘু নেতারা বলছেন, এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে, লক্ষ্য, হামলা চালিয়ে 'ক্লিনজিং' প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, ভোলার ঘটনায় দুটি ইতিবাচক দিক সামনে এসেছে। এক, প্রধানমন্ত্রী ষড়যন্ত্রটা অনুধাবন করেছেন। দুই, খোদ পুলিশ বলেছে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর তা প্রতিরোধে কোনো রাজনৈতিক দলকেই পাশে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতই বলবে, এর পরও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা। ■

*কুমিল্লায় মুসলমানদের তাণ্ডব।*

# সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পীঠস্থান কাশী

**ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিদ্যাচর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র হিসাবে কাশী তার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। জীতেন্দ্রানন্দ সরস্বতী জানিয়েছেন যে কাশীতে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়, চল্লিশটি ডিগ্রি কলেজ এবং ১৬০০ সংস্কৃত বিদ্যালয় বর্তমান।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে বর্তমানে ৩৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী, ৫০০০ শিক্ষক এবং ১৩০০ একর জমির ওপর বিশাল পরিসরে সেখানে মোট ১৪০টি বিভাগ রয়েছে।

যদিও নামের মধ্যেই 'হিন্দু' শব্দটা রয়েছে, কিন্তু বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুত্বের চর্চা নেই বললেই চলে। সংস্কৃত এবং সংস্কৃত- সম্পর্কিত বিভাগগুলিতে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রী আছেন, জানিয়েছেন অ্যাসট্রোলজি বিভাগের প্রধান ড. চন্দ্রমৌলি উপাধ্যায়। বেদ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, আইন এবং দর্শনশাস্ত্র পাঠ্যসূচিতে আছে। তাঁর বিভাগে ৩২ জন পড়ুয়া আছে যারা জ্যোতিষবিদ্যায় ডক্টরেট করতে চায়।

কাশীতে যত শিক্ষালয় আছে, যেখানে সংস্কৃতই মুখ্য বিষয়— তার মধ্যে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রধান। এটি সরকারি অর্থ সাহায্যে চলে। এই শিক্ষালয়টিকে গভর্নমেন্ট স্যাংস্কৃট ইউনিভার্সিটিও বলা হয়। ১৭৯১ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিল, এই বিশ্ববিদ্যালয় তারই উত্তরসূরি। ৬৭ একর জমির ওপর অবস্থিত এই শিক্ষালয়ে ২০০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী, ১১২ জন শিক্ষক, ২৩টি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বিভাগ, ৪০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ, কুড়িটি গবেষণা কেন্দ্র এবং দুই লক্ষ গ্রন্থ-সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। বারোশো কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যেসব ডিগ্রি প্রদান করে থাকে, সেগুলি সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতিক্রমেই প্রদত্ত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (ssvv.ac.in) অনুযায়ী 'সম্পূর্ণানন্দ একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচ্য শিক্ষাকেন্দ্র। এর একমাত্র উদ্দেশ্য শাস্ত্রসমূহের সংরক্ষণ এবং সেই সকল বিদ্বান তৈরি করা যাঁরা চিরকালীন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে পারদর্শী হবেন। এখানে পাঠ্যসূচিতে আছে বেদ, সংস্কৃত ও পালি ভাষা, জ্যোতিষশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রসমূহ, দর্শন শাস্ত্র (বৌদ্ধ ও জৈন সমেত) ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ও বেনারসের সমস্ত সংস্কৃত শিক্ষালয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বিষয়সমূহ এবং শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. দেবী প্রসাদের কথায়— ''আমাদের সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে যথার্থ গুরুত্ব দেয় না, শিক্ষকরাও অতীতে যে সম্মান পেতেন, এখন তা পরিলক্ষিত হয় না।''

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং এখন ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়োগো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্থানেশ্বর টিমালসিনা একই মত প্রকাশ করেছেন। ''ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক নেতারা সংস্কৃত ভাষাটাকে ব্যবহার করে থাকেন এমনভাবে যেন সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা শুধুই আনুষ্ঠানিক কিছু নিয়ম পালনের জন্য। তাঁরা ভুলে যান যে সংস্কৃত শুধু একটি ভাষা নয়, এটি একটি মহান দর্শন যা কিনা পৃথিবীকে একটি নতুন দিশা দিতে পারে।

ডক্টর উপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, বেনারসের প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির ৮০ শতাংশ আজ প্রায় বন্ধ হতে বসেছে, ১৯৯০ সাল থেকে সরকারি সাহায্য বিশেষভাবে কমে যাওয়ার ফলে।

বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শ্রী জিজ্ঞাসু স্মারক পাণিনি কন্যা মহাবিদ্যালয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানে কেবলমাত্র ছাত্রীরাই অধ্যয়ন করতে পারে। এই শিক্ষালয়টি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকে বিদ্যার্জন করে বহু ছাত্রী আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরতা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁরা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন যার মধ্যে গুরুকুলও আছে যেখানে সংস্কৃতশিক্ষা, বিভিন্ন শাস্ত্র ও পৌরোহিত্যের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই শিক্ষালয়ে ভর্তির ব্যাপারে কোনও জাতপাত মানা হয় না। সব ছাত্রীকেই বাধ্যতামূলক ভাবে মার্শাল আর্ট সেখানো হয় যাতে তারা প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করতে পারে। এই শিক্ষালয়টি বিভিন্ন স্থান থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। প্রাপ্ত অর্থেই এদের কাজকর্ম চলে। ছাত্রীদের থেকে যৎসামান্য অর্থ নেওয়া হয়।

আচার্যা নন্দিতা শাস্ত্রীর মতে, তাদের একটি হস্টেল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, যেটি হবে বহুতল বিশিষ্ট, আন্তর্জাতিক মানের এবং সর্বার্থেই আধুনিক। পাণিনি ক্যাম্পাসেই এই হস্টেলটি তৈরি হবে যেখানে সমগ্র ভারত তথা সমগ্র পৃথিবী থেকে মেয়েরা এখানে থেকে বিদ্যাচর্চা করতে পারে।

ধর্মসঙ্ঘ শিক্ষা মণ্ডল আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেটি শ্রদ্ধেয় ঋষি স্বামী করপঞ্জি (১৯০৭-১৯৮২) স্থাপন করেন। তিনি সরকারি আর্থিক সাহায্য কখনই কাম্য মনে করেননি। তিনি মনে করতেন সরকারি অর্থসাহায্য গ্রহণ করলে বিদ্যালয়ের বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ এড়ানো যাবে না। বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধান ড. জগজীতন পাণ্ডে জানিয়েছেন যে এখানে এখন শতখানেক পড়ুয়া বিদ্যালাভ করছে। আট থেকে এগারো বছর বয়সের শিশুদের ভর্তি নেওয়া হয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যন্ত এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু কোনও ডিগ্রি দেওয়া হয় না, কারণ এই শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন ডিগ্রি দেওয়া হলে সরকারি হস্তক্ষেপ এসে যাবে। এখানে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। পড়ুয়ারা বিনা অর্থব্যয়ে এখানে শিক্ষালাভ করে। পাঠ্যসূচিতে আছে বেদ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি।

ড. পাণ্ডে জানান, তাঁরা সনাতনধর্মে বিশ্বাস করেন এবং পুনর্জন্মেও তাঁরা বিশ্বাসী। ভাগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ পাঠান, যাঁরা বেদচর্চা করেন, সেই সঙ্গে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের চর্চাও করে থাকেন, তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ব্যবসায়িক কোনও বিদ্যার চর্চা করেন না। কাশীর বহু সংস্থার নিজস্ব বিদ্যালয় আছে। অন্নপূর্ণা মন্দির ১৯১৬ সালে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে আজ ২৫০ জন শিক্ষার্থী বর্তমান। এই বিদ্যালয়টি শতাধিক পুরোহিতকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জ্ঞান প্রকাশ একটি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে যেখানে তিন বছরের শিক্ষাক্রমে পুরোহিতদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়েও এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বীর শৈব জঙ্গমওয়াড়ী মঠের গুরুকুল বারো বছর ব্যাপী শিক্ষা দিয়ে থাকে একেকজন শিক্ষার্থীকে। এখান থেকে স্নাতক হবার পর শিক্ষার্থীরা বীর শৈব মন্দিরগুলিতে পুরোহিতের কাজ পায়। এই মঠ ষষ্ঠ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে অবস্থিত শ্রীমঠ একটি বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্র। চতুর্দশ শতকের সাধু রামানন্দের সংস্কার এরা আজও বহন করে চলেছে। এই মঠ চল্লিশজন শিক্ষার্থীবিশিষ্ট একটি গুরুকুল পরিচালনা করে এবং বেনারসের প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বহু শতাব্দী যাবৎ বেনারস ভারতের একটি অন্যতম প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত রাখতে পেরেছে। বিশেষ করে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে বেনারস যার প্রাচীন নাম কাশী, আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

# দিল্লিতে সংস্কৃত ভারতীর ঐতিহাসিক বিশ্বসম্মেলন

'লসতুসংস্কৃতম্ বিশ্বপোষকম্' লক্ষ্য নিয়ে সংস্কৃতভারতী আয়োজিত বিশ্বসম্মেলন গত ৯ থেকে ১১ নভেম্বর নতুন দিল্লির ছতরপর মন্দির পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশের ৫৯৩ জেলা থেকে এবং বিশ্বের ২৩ দেশ থেকে ৪২৮৬ জন প্রতিনিধি বিশ্বসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বসম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা সংবলিত 'প্রজ্ঞানম্' প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধরন। প্রদর্শনীতে সংস্কৃতভারতীর বিশ্বব্যাপী কাজের চিত্র ও বিবরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অবদান, প্রকাশন বিভাগ ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র ছিল।

প্রথমদিন সকালে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ দেবপূজারী বিশ্বসম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এই সময়ে শ্রীরামমন্দিরের রায় ঘোষণা হওয়ার সংবাদে প্রতিনিধিরা জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে উল্লাস প্রকাশ করেন। সম্মেলনের স্বাগত সমিতির সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন বলেন, আজকের এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার দিন সমগ্র ভারতবাসীর মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজন্মভূমি আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ অশোক সিংহলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতাপ ষড়ঙ্গী উপস্থিত ছিলেন।

এদিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ সোনি 'বিশ্বের বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধান' বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আজ সারা বিশ্বে অস্তিত্ব, অস্মিতা ও অহংকারের দ্বন্দ্ব চলছে। অস্মিতার ওপর অহংকার মাথা চাড়া দেওয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সব সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। তাই আজ সারা বিশ্বে সংস্কৃত অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন।

১০ তারিখে প্রকাশ্য সমাবেশে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, হরিদ্বারের মহামণ্ডলেশ্বর অবধেশানন্দ গিরি, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। হিমাচল প্রদেশে সংস্কৃতকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয় সংস্কৃতভারতীর পক্ষ থেকে। ১১ তারিখে বিশ্বসম্মেলনে আগত ভারতের বাইরের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে কয়েকজন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা সবাই সংস্কৃতেই তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল ও সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কামত উপস্থিত ছিলেন। দিনেশজী সংস্কৃতভারতীর কাজের প্রসারের জন্য যুব সমাজকে ১০ বছর সময় দানের আহ্বান জানান। সংস্কৃতময় পরিবেশে তিনদিনের বিশ্বসম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা উৎসাহ ও কাজের সংকল্প নিয়ে ফিরে যান। সবার মুখে ছিল ' জয়তু সংস্কৃতম্, জয়তু ভারতম্'।

## রোটারি সদনে ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির আলোচনাসভা

গত ১৭ নভেম্বর কলকাতার রোটারি সদনে ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ' সিন্ধু, সরস্বতী অ্যান্ড বৈদিক সিভিলাইজেশন ঃ নিউ পার্সপেক্টিভ' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্বদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক আনন্দ চন্দ্র সাহু এবং সংস্কৃত বিভাগের ড. হরেকৃষ্ণ মিশ্র। ভারতমাতার চিত্র ও ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির প্রাণপুরুষ প্রয়াত বাবাসাহেব আপ্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আলোচনা সভার শুভারম্ভ হয়। অধ্যাপক সাহু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় জনপদগুলির বর্ণনা তুলে ধরেন। ড. মিশ্র ভারতীয় জ্ঞানচর্চার প্রসঙ্গে বহু মত ও পন্থের উৎপত্তি ও মিলনের বর্ণনা করেন। সংস্থার সম্পাদক রবিরঞ্জন সেন আলেচনা সভা পরিচালনা করেন।

# বঙ্গজীবনের অঙ্গ অঘ্রানের মুলাষষ্ঠী

**নন্দলাল ভট্টাচার্য**

জীবনের প্রতীক ষষ্ঠী দেবী। তাঁরই কৃপায় ঘর ভরে ওঠে সন্তান-সন্ততিতে। ধন-সম্পদ-সমৃদ্ধি বা শান্তি সবই মেলে তাঁর কৃপায়। হিন্দু মননে, বিশেষ করে বঙ্গরমণী কুলের আন্তরিক প্রার্থনায় এমনটাই বর্ণিত হয়ে আসছে কালপ্রবাহের সেই প্রথম শুভক্ষণ থেকে। সে কারণে বছরের প্রায় প্রতিটি মাসেই রমণীকুল পালন করেন নানা ষষ্ঠীব্রত, ষষ্ঠীর পূজা-অর্চনা। বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রূপে ষষ্ঠীপূজা করা হয়। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ষষ্ঠীর এই সব ব্রত বা পূজার কোনো পৌরাণিক উৎস নেই। এর পূজা থেকে ব্রত পালন এবং ব্রতকথা পাঠ— প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুখ্য ভূমিকা বাড়ির সধবা মহিলাদের। এক্ষেত্রে পুরোহিত বা পুরুষসমাজের প্রায় কোনো ভূমিকাই নেই।

বছরের বিভিন্ন মাসে যেসব ষষ্ঠীব্রত পালন করা হয় তার অন্যতম হলো মুলা ষষ্ঠী বা মূলক-রূপিণী ষষ্ঠীর ব্রত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্রতের মতো এই ব্রতের ক্ষেত্রেও রয়েছে কৃষির এক বিশেষ ভূমিকা। সেই সঙ্গে যখন তখন বা যে কোন মাস বা দিনে যে আমিষ খেতে নেই তারও নীরব ঘোষণা যেন উচ্চারিত হয় এই ব্রতে।

এই ষষ্ঠী পালন করা হয় যাতে গোবৎসাদি নষ্ট না হয়। এই ষষ্ঠীব্রত পালনের বিধান হলো— বাড়িতে যতজন লোক থাকে ততগুলো ঘট বসিয়ে আঙট্ কলাপাতায় একুশটি পিঠে, একুশ টুকরো পাটালি, সর্ষের ফুল, মুলোর ফুল, কলমির ডোগ, হিঙ্‌চে, ওড়াধান, আউশ ধান দিয়ে দেবীকে পুজো দেওয়া হয়। এইদিন মায়েরা মুলো-ভাতে ও মুগের ডাল দিয়ে ভাত খান। অবশ্যই নিরামিষ খেতে হয়। অনেকে শুধুমাত্র পিঠে খান।

ষষ্ঠী দেবীকে এখানে কল্পনা করা হয় মূলক বা মুলা রূপে। হেমন্তের বিভিন্ন ফসলের অন্যতম হলো মুলা। বিভিন্ন কারণেই মুলা হলো শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী সবজি। আর সেই কথা মনে রেখেই সম্ভবত এই মুলাষষ্ঠী ব্রতর প্রবর্তন। কৃষির দিক থেকে অগ্রহায়ণ মাসেই মুলা পাওয়া যায় সবচেয়ে সতেজ ভাবে। এই সময় মুলা সুপুষ্ট আবার উপাদেয়ও হয়। পৌষে নবান্নের সময় মুলা ভোগ দেওয়া হয় কোথাও কোথাও। কিন্তু মাঘ মাসে বিশেষ করে বীজ সংরক্ষণের জন্য মুলা-ভক্ষণ নিষিদ্ধ লোকাচার মতে। তাই মাত্রই মাস দুয়েক যে ফসলটি পাওয়া যায় প্রকৃষ্টমতে তাকে কেন্দ্র করেই পালন করা হয় মুলাষষ্ঠী।

অন্যান্য ষষ্ঠীব্রতের মতোই মুলা-ষষ্ঠীর ব্রতও রাখেন সন্তানবতী মহিলারাই। এই ব্রত পূজার অন্যতম মূল উপরকরণ মুলা। মুলার বিভিন্ন পদ তৈরি করে তা নিবেদন করা হয় ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশ্যে। বাড়িতে অথবা গ্রামের ষষ্ঠীতলায় গিয়ে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়।

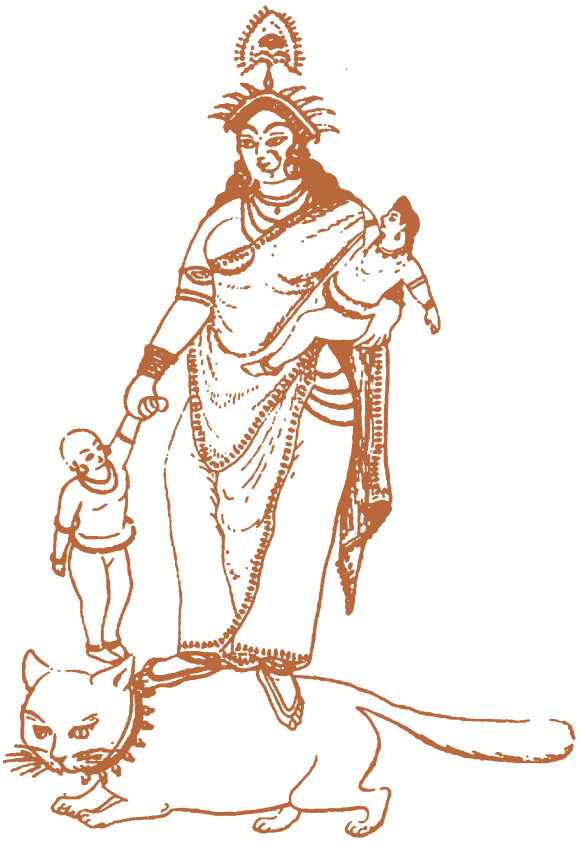

সূচনায় গোটা অনুষ্ঠানটিই ছিল মহিলাদের। পরবর্তীকালে অবশ্য বহু জায়গায় পূজকের ভূমিকাটি নেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই। তবে অন্যান্য অনুষ্ঠানে মুখ্য ভূমিকা নেন মহিলারাই।

মুলা ষষ্ঠীর ব্রতকথায় ফুটে ওঠে বঙ্গদেশে পল্লিজীবনেরই এক অপূর্ব ছবি। বিশ্বাস ও নির্ভরতার একটি আন্তরিক রূপের স্বতঃপ্রকাশ ঘটে এই ব্রতকথায়। এই ব্রতকথায় ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া কিছুটা বঞ্চিত অথচ চতুর পরিচারিকাদেরও বুদ্ধি-চাতুর্যের সরস পরিচয়।

এই ব্রতকথায় হয়েছে এক ব্রাহ্মণের সংসারজীবনের ছবি। ব্রত কাহিনি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ বিপত্নীক। ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে সংসার। একদিন ব্রাহ্মণের মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হলো। তিথি নক্ষত্র না দেখেই ব্রাহ্মণ বাজার থেকে কিছুটা হরিণের মাংস কিনে আনেন। তারপর ছেলের বউকে তা ভালো করে রান্না করতে বলে ব্রাহ্মণ বেরিয়ে যান কাজে।

শ্বশুরের মনের মতো করে মাংস রান্না করে বউ। মনের মধ্যে একটু খুঁতখুঁতুনি অবশ্য থেকে যায়। নুন ঝাল সব ঠিক মতো হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্যই বাড়ির কাজের লোককে এক টুকরো মাংস আর ঝোল চাখতে দেয় বউ। রান্নাটা হয়েছিল অপূর্ব। ওইটুকুতে তার তৃপ্তি হয় না। তাই সে নিল চালাকির রাস্তা। ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে ঝোলটা ছিল বড্ড গরম। সে কারণে ঠিক স্বাদটা

নেওয়া গেল না। আরেকটু দিলে ঠিক বলতে পারবে সে।

বউ আরও একটু মাংস আর ঝোল দেয়। দাসী সেটুকুও খেয়ে নেয় চেটেপুটে। তবু আশ মেটে না তার। তাই প্রায় একই কথা বলে বারবার চেয়ে নেয় মাংস চাখবার জন্য। বউও বুঝতে না পেরে হাতায় করে দিতেই থাকে। কোন সময়ে যে সে পুরো মাংসটাই দিয়ে ফেলেছে সে হুঁশ নেই।

যখন হুঁশ হলো, দেখে হাঁড়িতে পড়ে রয়েছে শুধু একটুখানি ঝোল। মাংসর ছিঁটেফোঁটাও নেই। বউ পড়ে আতান্তরে। দাসীকে বলে এবার কী হবে?

দাসীও বলে, তাইতো, এবার কী হবে?

বউটি বলে, তুই শিগগির বাজারে যা। আরও খানিকটা মাংস কিনে নিয়ে আয়। আমি আবার রান্না করবো এখন।

দাসী যায় বাজারে। কপাল খারাপ। বাজার তখন বন্ধের মুখে। দু' একটা দোকান খোলা থাকলেও মাংস নেই কোথাও।

দাসি ফেরার পথে দেখে বাগানে পড়ে রয়েছে একটা মরা বাছুর। উপায় না দেখে তার থেকেই খানিকটা মাংস কেটে তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে আসে। বউটি সেই মাংস রান্নায় চাপায়।

অনেকক্ষণ রান্না করার পরও মাংস ঠিক সেদ্ধ হয় না। বউটি দাসীকে বলে কী মাংস এনেছিস। এ যে চিমসে মেরে রয়েছে। সেদ্ধ হচ্ছে না কিছুতেই।

দাসী বলে কী জানি বাপু, আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

এমন সময় বামুন ঘরে এসে খেতে চাইল। বউ তো ভয়েই অস্থির। কী হবে এবার। কাঁপতে কাঁপতেই শেষকালে একটা উপায় বের করে বউ। দাসীকে বলে, তুই চারদিকে জল ফেলে পেছল করে রাখ, আমি পরিবেশন করতে যাওয়ার সময় পিছলে পড়ে যাব। তুই তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকে এমন ভাবে আমার চোখমুখে জল দিবি যে ভাত-তরকারি সব নষ্ট হয়ে যাবে।

কথা মতো কাজ। বামুনকে পরিবেশন করতে আসার সময় পা-পিছলে পড়ে বউ। দাসীও এক ঘটি জল তার মাথায় মুখে ঢালতে থাকে। আর তাতে নষ্ট হয়ে গেল হেঁসেলের সব। মাংস দূরে থাক বামুনের সেদিন আর অন্নই জুটল না।

বউটি পরে স্বামীকে বলল সব। তারপর দাসীকে বলে কোথা থেকে মাংস এনেছিস দেখাগে যা।

বামুনের ছেলেকে নিয়ে দাসী গিয়ে দেখায় কোথা থেকে মাংস এনেছে সে। দেখে তো বামুনের ছেলে হতভম্ব। ঘরে ফিরে বউকে বলে, দাসী একটা মরা বাছুরের মাংস এনেছিল। তাই সেদ্ধ হয়নি ওটা।

দিনটা ছিল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী। বউ তাড়াতাড়ি মুলা, কলা, পান দিয়ে মা ষষ্ঠীর পুজো করে মরা বাছুরের ওপর সেই ফুল জল ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠল মরা বাছুর। তাই দেখে সকলে অবাক। ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল চারিদিকে।

বউ এবার সব কথা খুলে বলে শ্বশুরকে। শুনে রাগ না করে বউয়ের সুখ্যাতিই করে শ্বশুর।

বউ এবার খুব ঘটা করে ষষ্ঠীর পুজো করে বলে, অঘ্রাণমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে মাছ-মাংস খেলে গোমাংস খাওয়ার পাপ হবে।

তারপর থেকে সকলেই ওইদিন ষষ্ঠীর পুজো করে মাংসের বদলে মুলোর তরকারি দিয়ে রুটি খায়। আর তা থেকেই এর নাম হলো মুলা ষষ্ঠী। ক্রমে ক্রমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এই পুজো। সকলে খুব ভক্তি ভরে ষষ্ঠীর পুজো করতে থাকে। এক সময় অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে এই মূলা ষষ্ঠী ব্রত পালন করা হতো। এখন এই ব্রত পালনের চল কিছুটা কমেছে। তবে এই দিনটিই মহারাষ্ট্রে এখনও মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় চম্পাষষ্ঠী হিসেবে। কোথাও কোথাও এই দিনটি গুহষষ্ঠী হিসেবে পালিত হয়।

মুলা ষষ্ঠী সম্পূর্ণভাবেই একটি মেয়েলি ব্রত। এই মেয়েলি ব্রতের মধ্য দিয়েই বঙ্গপ্রদেশের সমাজজীবনের একটি বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। ▮

# রাঢ় বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ধারা লেটো গান

**তিলক সেনগুপ্ত**

নেই কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নেই ছকে বাঁধা পাণ্ডুলিপি বা বই। কোনোরূপ লিখিত সংলাপেরও প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র সহজাত কাব্য রচনার দক্ষতা ও নাট্যবোধের দৌলতেই হঠাৎ যে কোনো বিষয় নির্বাচন করে মুখে মুখেই তৈরি হয় গান তার সঙ্গে সুর ও সংলাপ। আর পুরুষরাই মহিলা সেজে মঞ্চ মাতায় কণ্ঠস্বর বদল করে। যা বাঙ্গলার বিলুপ্ত প্রায় লেটো গান হিসেবেই সমাদৃত।

রাঢ় বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ধারা এই লেটো গান। যা আজ ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে বীরভূমের মহম্মদবাজারের খড়িয়া গ্রামের বৃদ্ধ শিল্পী হরকুমার গুপ্ত আজও বুকে আঁকড়ে রেখেছেন সেই প্রাচীন লেটো গানের ধারা। দল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। লেটো গান নিছকই গান বললে ভুল বলা হবে। একে হাস্যরস মেশানো নাটক বলাই শ্রেয়। যার মধ্য দিয়ে শাণিত হয় সামাজিক ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গার্থক প্রতিবাদ। ছড়িয়ে পড়ে নানান সামাজিক বার্তা। যাত্রাগানের মতোই পালার আকারে তৎক্ষণাৎ রচিত এ গান নৃত্য ও অভিনয়-সহ পরিবেশন করা হয়, সঙ্গে থাকে বাদকদল।

লেটো গান শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। সখি, সংদার, পাঠক বিভিন্ন নামে নট-নটীরা গান ও নাচ পরিবেশন করে। পুরুষরা মেয়েদের পোশাক পরে নটী সাজে। এর বিষয়বস্তু সামাজিক রঙ্গরস ও আটপৌরে গ্রামীণ জীবন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও পালা রচিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম শৈশবকালে লেটোদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত রাজপুত্রের সং, চাষার রঙ, আকবর বাদশা প্রভৃতি লেটো গানের সন্ধান পাওয়া গেছে।

লেটো গানে অনেক সময় দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতাও হয়, দলের প্রধানকে বলা হয়

'গোদা কবি'। যাকে মূল গায়েনও বলা হয়। সাধারণত শীতের ফসল ওঠার পরে কৃষকের অবসর সময়ে লেটো গানের আসর বসে। লোকমনোরঞ্জনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে একই সঙ্গে সমাজের অসঙ্গতিকে লেটোর দল সবার নজরে আনে তাদের উপস্থাপনা দিয়ে। প্রধানত মুসলমান সমাজে লেটো গানের সমাদর বেশি, তবে সব ধরনের শ্রোতাই এ গান উপভোগ করে।

সেই হারিয়ে যেতে বসা লেটো গানকে বাঁচিয়ে রাখতে গ্রামের নতুন প্রজন্মকে লেটো শেখানোয় মেতে থাকেন বৃদ্ধ হরকুমার গুপ্ত। সেই ছোট্ট বয়স থেকেই এই লেটো গানের সঙ্গে নিজেকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছেন হরকুমার গুপ্ত। লেটো শিল্পী হিসাবে যাকে একনামে চেনেন জেলা তথা রাজ্যবাসী। ন্যুব্জ শরীরেও নিত্যনতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় আজও মশগুল বৃদ্ধ হরকুমার। দমাতে পারেনি তাঁর বয়স। তাই ইদানীং চারপাশে চলা অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে হরকুমার গলা আজও সমান ঝাঁজালো— ''বাবাগো! ছারপোকা কামড়াই দিলে গো/ কিচির মিচির আওয়াজে ঘুম আসে না গো!'' শুধু তাই-ই নয়, নারী নির্যাতন, পণ প্রথা, মানুষের মানুষে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে চড়ানো হরকুমার ও তাঁর দলবল— লেটো গানের মাধ্যমেই।

শিল্পী হরকুমার গুপ্তের কথা থেকে জানা যায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের ইলামবাজারের দ্বারোন্দা গ্রামেই ছিল শিল্পীর বাড়ি। মা-বাবা চার ভাইবোনের সংসারে তখন অভাবে থালায় পান্তা ভাত ভাগাভাগি করে খেতে হয়েছে। পকেটে মাত্র ১ টাকা নিয়ে ১২-১৩ বছরের কিশোর হর গুপ্ত কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। একাজ-ওকাজ করতে করতে শেষমেশ ঠাঁই হয় লেটোর দলে। তখন বীরভূমের একাধিক জায়গায় লেটোর নামকরা দল ছিল। তারপর থেকে লেটোই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ১৯৭৯ সালে তৈরি করেন 'শ্রীদুর্গা লেটো আসর।' জেলা, রাজ্যের হেন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে লেটো শোনাননি হরকুমার গুপ্তের দল। পেয়েছেন অজস্র সম্মান, পদক, সংবর্ধনা। দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সই করা স্বীকৃতিপত্র।

তাঁর লেটো গানের দলের সদস্য আমির আলি, জটাই ভুঁইমালি, তুলসী ভুঁইমালি, তুলসী ভুঁইমালির গান, অভিনয়, চণ্ডী বাউরির তবলা আর প্রশান্ত দাসের বাঁশি জমিয়ে দেয় মানুষের ভিড়। স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্রীদুর্গা লেটো আসরে নাম লিখিয়েছেন জ্যোৎস্না বেগম। আর শিবু দাস ও সুবোধ বাদ্যকরের উপর ভার পরে প্রতি পালায় মেয়ে সাজার। লেটোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে। রং মেখে সেজেগুজে মঞ্চে ওঠলে তখন ধরার উপায় থাকে না এঁরা পুরুষ। শিল্পী হর গুপ্ত রসিকতা করে বলেন, ''শিবু যখন আমার পাশে মেয়ে সেজে অভিনয় করে ওঁর স্ত্রী ও আমার স্ত্রী দুজনেরই চরম গোঁসা হয়।'' লোক সংস্কৃতির গবেষক আদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেন, ''মালদা মুর্শিদাবাদ বীরভূমে এক সময় ছিল বাঙ্গলার অন্যতম লোক সংস্কৃতির ধারা আলকাপ লেটো। আজ যা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সমাজের বর্তমান অবস্থা, লোক শিক্ষার বিষয়কে অবলম্বন করে স্বরচিত, সুরারোপিত, কোনো স্ক্রিপ্ট ছাড়া, বই ছাড়া যে লোক সংস্কারের ধারা ছিল আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে। বীরভূমের হর গুপ্ত ছাড়া আর কোনো লেটো শিল্পী নেই।'' নাট্য ব্যক্তিত্ব গবেষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, ''লোকনাট্য হিসাবেই লেটোর কদর ছিল এক সময় সারা বাঙ্গলা জুড়ে। লেটো বাঙ্গলার লোক সংস্কৃতির একটি আদি ধারা। তবে আজ তা হারিয়ে যেতে বসেছে।'' ■

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩


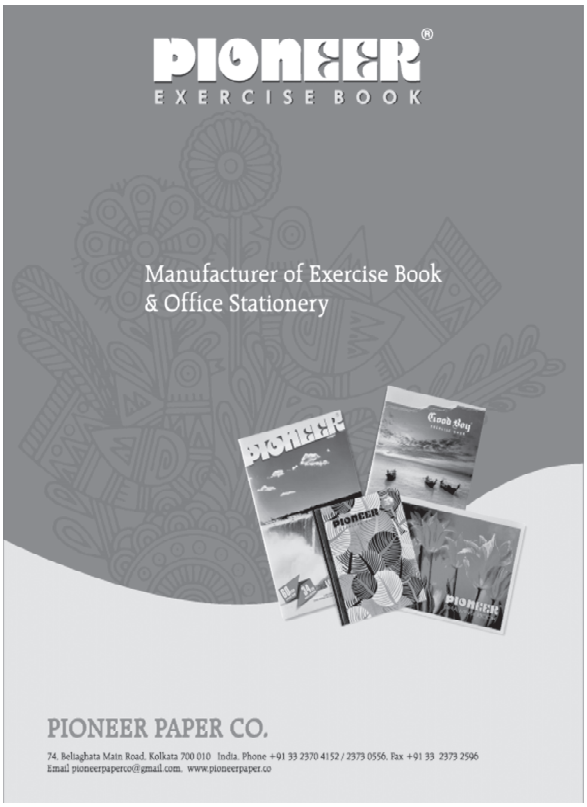



# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

**শান্তিনিকেতন, বোলপুর,**
**মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫**


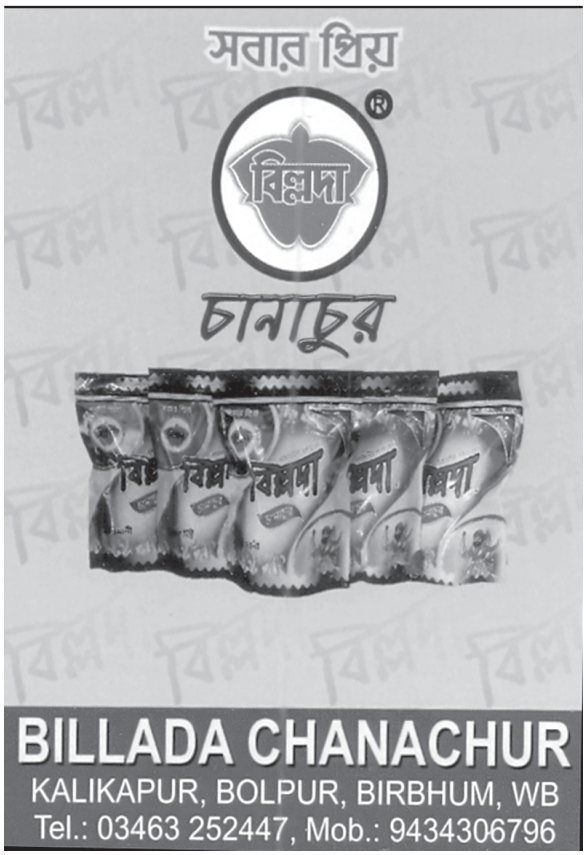

# ডানা

পিন্টু ভট্টাচার্য্য

‘তোমাকে কতদিন ধরে বলছি আমাকে একটা সাইকেল কিনে দাও, তাও দেবে না আবার নিজেও নিয়ে যেতে গেলে বিরক্ত হবে। এভাবে চলতে পারে না। আমি আর কারুর কথা শুনব না। কাল আমি নিজেই একটা সাইকেল কিনে আনব।’ ক্ষেপে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল মলি। অনীশ জানে মলি এখন গজগজ করতেই থাকবে, সহজে থামবে না। মাঝখানে কোনো কথা বলতে গেলে আরও বিপদ। বেগতিক বুঝে টুক করে কেটে পড়ল সে।

মনে মনে কিন্তু মলিকে সমর্থনই করল অনীশ। মলির সাইকেলের দাবিটা আজকের নয়, বিয়ের কিছুদিন পরেই সে বলেছিল— “আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিলে তোমার কাজে আমিও কিছুটা সাহায্য করতে পারি। তুমি একা মানুষ। দোকান, বাজার, অফিস— কত করবে? একটা সাইকেল থাকলে আমিও কিছুটা হেল্প করতে পারি।”

মলির কথায় যুক্তি ছিল। অনীশদের বাড়িটা শহর থেকে একটু দূরে। বাড়িটা বাবারই করা। এদিকটা তখন সবে গড়ে উঠছে। এদিকে বাড়ি করার প্রধান কারণ জমিটা অনেক কম দামে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অসুবিধা ছিল অনেক। বাড়ির কাছাকাছি কোনো দোকানপাট ছিল না। এখন তবু দু’একটা ছোটো মুদিখানার দোকান হয়েছে। সবচেয়ে কাছের দোকানটা বাড়ি থেকে অন্তত আধ কিলোমিটার দূরে। বাজারে সাইকেলে গেলেও কম করে দশ মিনিট লাগে। বাড়ির কাছে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। আগে একটা রিকশা ধরতে গেলেও দশ মিনিট হাঁটতে হতো। এখন অবশ্য ফোন করলে টোটো আসে, তবে যাত্রী বিশেষ পাওয়া যায় না বলে ভাড়া লাগে দু’তিন গুণ বেশি। অনীশের অফিসটাও বাড়ি থেকে বেশ দূরে, কাজের চাপও খুব। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোয় আর ফেরে সন্ধ্যে সাতটার পর— ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে। তখন আর কোনো কাজে বেরোনোর মতো অবস্থা থাকে না তার। যত কাজ সে সেরে রাখে রবিবারে বা ছুটির দিনে। ছুটির দিনগুলোতেও বিশ্রাম নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না তার।

বাবা বেঁচে থাকতে দোকান-বাজারের কাজটা বাবাই করতেন। কিন্তু অনীশের বিয়ের ঠিক তেষট্টি দিনের মাথায় স্ট্রোক হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই সব কাজের দায়িত্ব অনীশের ঘাড়ে। অনীশের কাজের চাপ কিছুটা কমানোর জন্যই মলি বলেছিল— “একটা সাইকেল কিনে দিলে দোকান-বাজার তো আমিও করতে পারি। বিয়ের আগে তো আমিই করতাম সব।”

মলির কোনো ভাই নেই। ওরা দুই বোন। বাবা বি.এস.এফ.-এ চাকরি করত। বাড়ি আসত ছ’ মাস অন্তর। বড়ো হওয়ার পর বাইরের কাজ তাই মলিকেই করতে হতো। মলির একটা সাইকেল ছিল। সেটা

চালিয়ে সে পড়তে যাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, দোকান-বাজার করা-সব কাজ করত। সাইকেল চালানোয় মলি খুব ওস্তাদ। শহরের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ক্যারিয়ারে বোনকে বসিয়ে সে বনবন করে সাইকেল চালিয়ে চলে যেত। বিয়ের পরে সেই সাইকেলটা বোনকে দিয়ে দেয়।

মলির কথাটা মা শুনে ফেলেছিল। মলির সামনে কিছু না বললেও আড়ালে অনীশকে বলেছিল— ''দেখ বাবা, বিয়ের আগে বউমা যা করেছে করেছে, কিন্তু বিয়ের পরে বাড়ির বউ সাইকেল চালিয়ে বেড়াবে, এটা ভালো দেখায় না।'' ঠিক এই কথাটাই অনীশও ভাবছিল। বাড়ির বউ সাইকেল চালিয়ে দোকান-বাজার করবে— এটা তারও মনঃপূত নয়। সাইকেলটা সে যাত্রা আর কেনা হয়নি। মলিও দু'একবার বলার পর বুঝে গিয়েছিল তার সাইকেল চালানোটা মা আর ছেলের পছন্দ নয়। সেও আর কথাটা তোলেনি তারপর।

টিনা হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হবার পর সাইকেল কেনার কথাটা আবার তুলল মলি। টিনা মলি আর অনীশের একমাত্র মেয়ে। বয়স দশ পেরিয়েছে। মাস ছয়েক হলো হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। স্কুলটা বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। আর একটু কাছে আর একটা গার্লস স্কুল আছে, কিন্তু রেজাল্ট তত ভালো হয় না বলে দূরের স্কুলে দেওয়া। একটা টোটো ঠিক করা হয়েছে। পাড়া থেকে আরও তিনটে মেয়ে যায়। মাসে হাজার টাকা টোটো ভাড়া দিতে হয়। টোটোটা ঠিক করার সময়ই মলি বলেছিল— ''এতগুলো টাকা শুধু শুধু নষ্ট করার কী দরকার। আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিলে আমিই ওকে দিয়ে আসা নিয়ে আসা করতে পারি। টিনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার তো কোনো কাজও থাকে না। একা একা কত আর ভালো লাগে। তাছাড়া দিনকাল ভালো নয়। টিভিতে দেখায় আজকালকার গাড়িওয়ালারাও খুব খারাপ। কাউকে বিশ্বাস নেই। ছোটো হলেও মেয়ে তো। মেয়েটা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমি খুব চিন্তায় থাকি। তোমার আর কী, অফিসের কাজ নিয়ে থাকো, আমাদের কথা ভাবার সময় আছে নাকি তোমার?'' কথাগুলো যে মলি সব একবারে বলেছিল তা নয়, তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই যুক্তিগুলোই সে দু'তিন মাস ধরে দিয়ে যাচ্ছে সাইকেল কেনার জন্য। অনীশ ভেবে দেখেছে মলির কথাগুলো ফেলে দেওয়ার মতো নয়। মলির মতো অতটা না হলেও টিনাকে একা একা স্কুলে পাঠিয়ে চিন্তা তারও হয়। সাইকেল একটা কিনে দিলে অনেকগুলো সমস্যা মেটে, মেয়েকে নিয়ে চিন্তা দূর হয়, তার বাড়ির কাজের ঝামেলাও অনেকটা কমে, মাসে মাসে হাজারটা টাকাও বাঁচে। মাও আর বেঁচে নেই যে বউমাকে সাইকেল চালাতে দেখে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবে। তবে মা মারা গেলেও তার মনোভাবটা অনীশের মধ্যে বেঁচে আছে। বউ সাইকেল চালিয়ে বাজার-হাট করে বেড়াবে এটা মন থেকে মেনে নিতে তার আপত্তি আছে। কিন্তু তার বাইরে আরও একটা কথা আছে। তারা হাই রোডের যেদিকে থাকে মূল শহরটা তার উলটো দিকে। স্কুলে বা বাজারে যেতে গেলে হাইরোড দিয়ে অনেকটা রাস্তা যেতে হয়। অনীশের মনে একটা ভয় কাজ করে, হাইরোড দিয়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে যদি মলি অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলে। রাস্তা দিয়ে যেভাবে বাস লরিগুলো যায় আজকাল! তার এই আশঙ্কাটা একদিন মলির কাছে ব্যক্ত করেছিল সে। শুনে তো মলি হেসেই অস্থির। বলেছিল— ''আমি বিয়ের আগে সাইকেলে করে সারা শহর ঘুরে বেড়াতাম। তাও একা নয় বুঝলে, পিছনে বোনকে নিয়ে। সাইকেলটা আমি অনেকের থেকেই ভালো চালাতে পারি। এনে দাও একটা, চালিয়ে দেখিয়ে দেব।'' অনীশ প্রতিবাদ করে বলে— ''সেটা বিয়ের আগে। মাঝে চোদ্দটা বছর কেটে গেছে সেটা খেয়াল আছে।'' ছাড়বার পাত্রী নয় মলিও— ''সাইকেল চড়া আর সাঁতার কাটা একবার শিখলে আর কেউ ভোলে না, এটাও জানো না।'' —''জানব না কেন? আসলে আজকাল যেভাবে বাইক চালায় সবাই, খুব ভয় করে।'' শেষ চেষ্টা করে অনীশ। ''ওসব ফালতু যুক্তি দিও না তো। রাস্তায় যেন আর কেউ সাইকেল চালাচ্ছে না? আসল কথাটা বললেই তো হয়, আমি সাইকেল চালাই এটা তোমার পছন্দ নয়।'' গলায় স্পষ্ট রাগের সুর। মলির এই একটা দোষ। চট করে রেগে যায়। আর একবার রেগে গেলে তাকে সামলানো বড়ো মুশকিল। অনীশ তাড়াতাড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করে— ''তা নয় মলি। ভয় হয় তুমি ক'দিন বিছনায় পড়ে থাকলে সংসারটার কী হবে? জানোই তো আমার চাকরির অবস্থা, কামাই করার উপায় নেই।'' মলিও নরম হয়ে বলে— ''আমি বলছি কিছু হবে না। ক'দিন না হয় মাঠে প্র্যাকটিস করে নেব।'' অগত্যা রাজি হয়ে যায় অনীশ— ''ঠিক আছে ক'দিন সময় দাও, এবার একটা সাইকেল কিনেই দেব তোমায়।'' মলিকে কথাটা বললেও, মলির সাইকেল চালানোর দৃশ্যটার কথা ভাবতে গেলেই মনের মধ্যে একটা খচখচানি টের পাচ্ছিল অনীশ।

পরামর্শটা সুভাষদাই দিল। সুভাষদা অনীশের কলিগ, তার পাশের টেবিলে বসে। পাশাপাশি বসার সুবাদে দুজনের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। পারিবারিক সমস্যা নিয়েও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়, পরামর্শ দেওয়া নেওয়া চলে। বয়েসে অনেকটা ছোটো বলে সুভাষদা অনীশকে তুই বলে। সব শুনে সুভাষদা বলল— তোর যখন সাইকেলে আপত্তি, বউকে একটা স্কুটি কিনে দে। ই.এম.আইতে পেয়ে যাবি। আজকাল অনেক মেয়ে চালায়। কাজেরও সুবিধা হবে, তোর মনের খচখচানিটাও থাকবে না।

—চালাতে পারবে তো?

—কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো সাইকেল চালাতে পারে যখন স্কুটি চালানোও তাড়াতাড়ি শিখে যাবে। একদম সহজ কাজ। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল অনীশ কাল হিরোর শোরুমে গিয়ে একটা স্কুটি পছন্দ করে অসবে, লোনের ব্যাপারটা দেখে নেবে, তারপর পরের রবিবারে একেবারে কিনে এনে

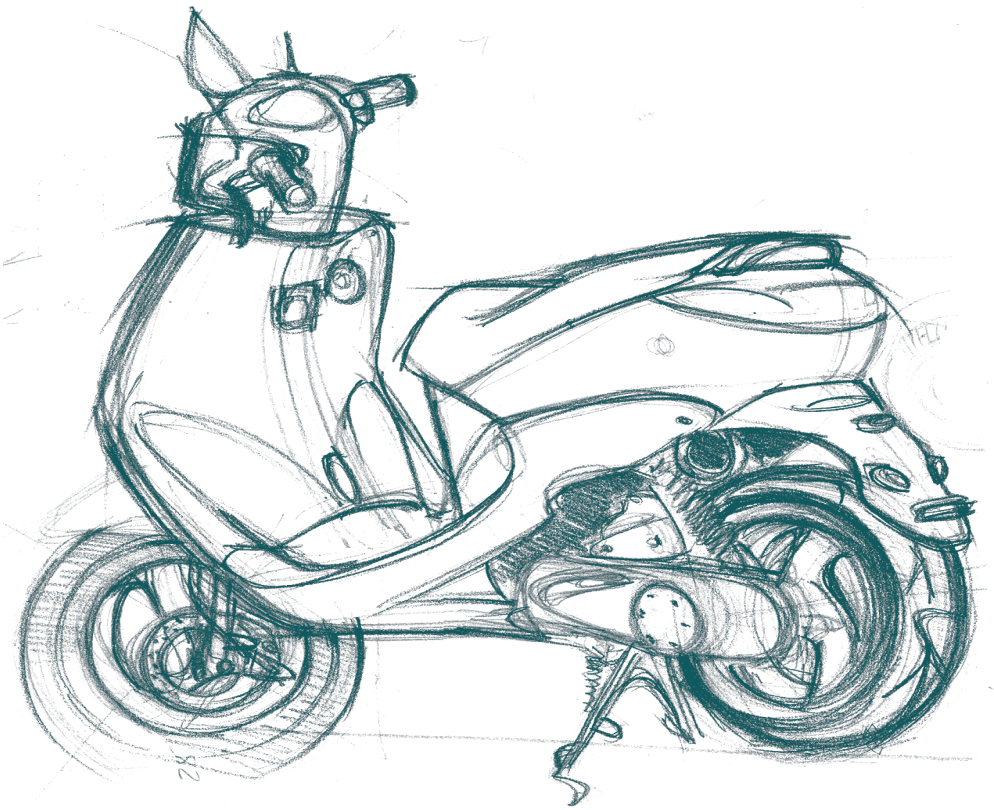

হাজির করবে। জন্মদিনে একটা গ্রেট সারপ্রাইজ দেবে মলিকে। কিন্তু আজকেই ঘটনাটা ঘটে গেল। অফিস থেকে ফিরে চাটা খেয়ে খবরের চ্যানেলটা সবে খুলেছে, মলি এসে দাঁড়াল— ''কাল সকালের দিকে আমাকে একটু বাজারে নিয়ে যাবে, টুকটাক কিছু কেনাকাটা আছে।''

অনীশ বলল— ''কাল হবে না, আমার অন্য কাজ আছে।''

তারপরেই মলির ওই ক্ষোভে ফেটে পড়া। মলি চিৎকার করেই চলল— ''এমন জায়গায় বাড়ি করেছে, কিছু পাওয়া যায় না। নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই, সবসময় লোকের ওপর ভরসা। কখন একজনের সময় হবে, তবে অমি একটু বেরোতে পারব। এভাবে চলে? কত অন্যের ওপর ভরসা করে চলা যায়?''

মলির চিৎকার চলতেই লাগল। এর মধ্যে কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত বুঝে অনীশ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যখন বাড়ি ফিরল তখন ঝড় থেমেছে ঠিকই, কিন্তু চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। কোনো কথা না বলে অনীশ টুক করে ঘরে ঢুকে পড়ল। খাওয়ার পর নিঃশব্দে সব কাজ সেরে ঘরে ঢুকল মলি। আলমারিটা খুলে নিজের জমানো টাকা থেকে চার হাজার টাকা বের করে অনীশের সামনে রেখে বলল— ''যত কাজই থাক না কেন, কালই তুমি আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবে।''

টাকাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে অনীশ বলল— ''ছি ছি তুমি একথা ভাবতে পারলে? আমি টাকার জন্য তোমায় সাইকেল কিনে দিচ্ছি না। আমাকে আর সাতটা দিন সময় দাও, সব ব্যবস্থা করে ফেলব।''

—''আমার দিকটা কোনোদিন ভেবেছ তুমি? সারাদিন বাড়ি থাকো না, মেয়েটাও ইস্কুলে চলে যায়। বাড়িতে আমি একদম একা, কী করে সময় কাটে আমার। টিভিতে ওইসব ছাইপাঁশ সিরিয়াল আর কত দেখা যায়। একটা সাইকেল থাকলে টিনাকে দিয়ে আসা নিয়ে আসা করে, বাইরের টুকটাক কাজ করে আমারও তো সময়টা কাটে।'' মলির গলার স্বর স্পষ্টতই কান্নাভেজা। অনীশ মলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চোখ থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে। পরের রবিবার মলির জন্মদিনে একটা ঝকঝকে লাল রঙের স্কুটি কিনে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল অনীশ— ''মলি, মলি, দেখ তোমার জন্যে কী এনেছি?''

মলি রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে নতুন স্কুটিটার দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে উঠল— 'এটা আমার জন্য আনলে?' তার মুখমণ্ডলে খুশির বন্যা।

—হ্যাঁ, তোমার জন্মদিনের উপহার। চালাতে পারবে না?

—কেন পারব না? চালাতে পারি তো। ছোটোমামা শিখিয়েছিল। আগে মামার বাড়ি গেল ছোটোমামাকে পিছনে চাপিয়ে তার স্কুটি নিয়ে কত ঘুরেছি।

—তাই? আগে বলনি তো কোনোদিন।

—চোদ্দ বছরে আর বলার সুযোগটা দিলে কোথায়।

পরের রবিবারের ঘটনা। বাজারে যাবে বলে রেডি হচ্ছিল অনীশ, মলি ঘরে ঢুকে বলল— আজকে তোমার সম্পূর্ণ ছুটি। বাজার করতে আমি যাব, টাকাটা দাও।

অনীশ মুখ ঘুরিয়ে দেখল চুড়িদার পরে হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছে মলি। সংশয়মাখানো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল— একা একা যেতে পারবে তুমি?

—তোমাকেও পিছনে করে নিয়ে যেতাম, কিন্তু টিনার গানের টিচার আসবে এখনই, তোমাকে বাড়িতে থাকতে হবে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনীশ দেখল স্কুটিতে স্টার্ট দিয়ে সেটা সাবলীলভাবে রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মলি, আস্তে আস্তে স্পিড বাড়ছে তার। অপস্রিয়মাণ স্কুটিটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, স্কুটি চালিয়ে নয়, যেন দুটো ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ে যাচ্ছে মলি। মলিরও যে দুটো ডানা থাকতে পারে, গত চোদ্দো বছরে সেটা মাথাতেই আসেনি তার। ▮

# বঙ্গভূমির এক বিস্মৃতপ্রায় পিয়ানো-প্রতিভা

**কৌশিক রায়**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত মহা-উপন্যাস— 'ঘরে বাইরে'-র চলচ্চিত্র রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই ছায়াছবিতে নিখিলেশ (ভিক্টর ব্যানার্জি)-এর স্ত্রী বিমলার (স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়) পিয়ানো শিক্ষিকা রূপে ছিলেন প্রয়াত বলিউড-তারকা শশী কাপুরের স্ত্রী জেনিফার কাপুর (কেন্ডাল)। বস্তুতপক্ষে, উত্তম-সুচিত্রা বা ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনী অভিনীত বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবিতে অনেক সুপারহিট গানের অনুষঙ্গ হিসেবে পিয়ানোকে দেখা গেলেও হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, এসরাজ, সেতার, সরোদের মতো ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির পাশাপাশি সাগরপারের দেশ থেকে আসা এই পিয়ানোকে কিন্তু ততটা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারেননি ভারতীয়রা, তা সে ৭০-৮০-র দশকের তরুণ ভারতীয় প্রজন্ম, রিচার্ড ক্লেভারমানের পিয়ানো বাদনের মূর্চ্ছনাতে যতই সম্মোহিত হয়ে উঠুক না কেন। তবে, এই বাঙ্গলার মাটিতেই, ইতিহাসের গোপন গুহাবন্দরে এতদিন লুকিয়ে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের এক প্রতিভাময়ী পিয়ানো শিল্পীর গুপ্ত কাহিনি।

বাঙ্গলার ইতিহাসের পাতায় বিবর্ণ হয়ে আসা সেই নিভৃতচারিণী, পর্দানসীনা নারীটির নাম মোনিকা গুপ্তা। ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, বেগম রোকাইয়া সাখাওয়াত হোসেন, মানকুমারী বসু, সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় (নাইডু), তরুবালা দত্ত, রানি রাসমণি, জ্ঞানদানন্দিনী এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর মতো স্বয়ংপ্রভ নারী-রত্নের বর্ণচ্ছটায় অনেকটাই মলিন হয়ে রয়েছেন স্বল্পভাষিণী, হুগলির চুঁচুড়া নিবাসিনী এই মোনিকা গুপ্তা।

'ইন্ডিয়ান জার্নাল অব জেন্ডার স্টাডিজ'-এর রচয়িতা, গবেষিকা মালবিকা কার্লেকার এবং 'সম্পর্ক' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার সুনন্দন রায়চৌধুরী এই অনাম্নী পিয়ানোবাদিকা মোনিকা গুপ্তার সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৯২১ সাল নাগাদ, ১৫ বছর বয়সী মোনিকা গুপ্তা বাবা ও দাদার সঙ্গে চুঁচুড়া ফেরিঘাট হয়ে নৈহাটি রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদহ স্টেশনে আসতেন। সেখান থেকে পর্দাঘেরা, ঘোড়ায় টানা 'ল্যান্ডো' বা 'ফিটন' জুড়ি গাড়িতে চেপে বউবাজারের লোরেটো হাউস বিদ্যালয়ে বেলা ১১টা নাগাদ পৌঁছোতেন। সেখানে মাদার জার্মেইন নামে এক ফরাসি সন্ন্যাসিনীর লজে পিয়ানো বাজানোর তালিম নিতেন তিনি। নিজের হাতে দিনলিপি লিখতেন মোনিকা। তাঁর সেই দিনলিপির খাতাগুলো থেকেই অনেক কিছু জানতে পারা গেছে এই অজ্ঞাত পিয়ানো বাদিকা সম্পর্কে। নিঃসন্দেহে, ইংরেজ-শাসিত, কুসংস্কারগ্রস্ত, পুরুষ-শাসিত বঙ্গসমাজে নারীমুক্তির আরও একটি স্ফুলিঙ্গ মোনিকা গুপ্তাকে ঘিরেই অলক্ষ্যে জ্বলে উঠেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জানা গেছে— মোনিকা গুপ্তার বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন উঁচুতলার সরকারি আধিকারিক। সুতরাং, শ্বেতাঙ্গ আদবকায়দা এবং অভিজাত অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতো মোনিকার। সেই সূত্র ধরেই আট বছর বয়স থেকে পিয়ানো বাজানো শিখতে শুরু করেন মোনিকা। মা সরলা দেবী বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি আজন্ম বিশ্বাসী গৃহবধূ হলেও মোনিকাকে উৎসাহ দেন পরবর্তীকালে লোরেটো হাউসে গিয়ে পিয়ানো শিখতে।

মোনিকার বাবা চুঁচুড়াতে বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার নিযুক্ত হন। ইংরেজ আধিপত্য তখন থাকলেও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ওলন্দাজদের প্রাধান্য ছিলই। চুঁচুড়ার পূর্বতন ডাচ গভর্নরের প্রাসাদোপম বাংলোতে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। মোনিকার দিনলিপি থেকে জানা যায়— সেই বাড়িতে ছিল দামি ও বিদেশি শ্বেতপাথরের মেঝে, কাশ্মীরি গালিচা, ছোটোখাটো একটি পশুউদ্যান এবং রাজসিক রেলিং যুক্ত সিঁড়ি। মোনিকা তাঁর নতুন পাওয়া পিয়ানোটি প্রথমে তাঁর শোবার ঘরে রাখতে চেয়েছিলেন। মায়ের নির্দেশে সেটি স্থানান্তরিত হয় বৈঠকখানায় আভিজাত্যের প্রতীক রূপে। পিয়ানো বাজানোর পাশাপাশি মোনিকা লন টেনিস খেলাও শেখেন— যেটা সে যুগের প্রায় নিরক্ষর এবং গৌরীদান হওয়া বাঙ্গালি মেয়েদের কাছে ছিল অকল্পনীয়! সরলা দেবী চেয়েছিলেন— পিয়ানোতে দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি মেয়ে মোনিকা যাতে হেলেন উইলস মুডি, ফ্রেড পেরি, কার্লোটা কুপার, হেলেন জ্যাকবসদের মতোই লন টেনিসে খ্যাতনাম্নী হয়ে ওঠেন। আসলে মোনিকার মা সরলা ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় আই. সি. এস. এবং 'বঙ্গবিজেতা', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', 'মাধবী কঙ্কন'-এর মতো বিখ্যাত ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির লেখক, ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র দত্তের কন্যা। তাই, পিতৃদত্ত আভিজাত্য ও মেধা সরলা দেবী দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কন্যা মোনিকাকে।

লোরেটো স্কুলে মোনিকা গুপ্তার পিয়ানো শিক্ষিকা মাদার জার্মেইনের খুবই ইচ্ছা ছিল— মোনিকা যেন প্রথম বঙ্গতনয়া হিসেবে ইংল্যান্ডের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব মিউজিকে পিয়ানো বাদনে বিশেষ তালিম নেন। মোনিকার পিয়ানো বাজানো শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকের ফরাসি প্রতিষ্ঠাতা মাঁসিয়ে সাঁদ্রে। মোনিকার বাবা অবশ্য চাননি মেয়ে কালাপানি পার হয়ে বিদেশে পিয়ানো শিখুক। তাই, বাঙ্গলার মাটিতে এক সম্ভাবনাময়ী প্রতিভার পিয়ানো বাজানোতে যবনিকা পড়েছিল সেখানেই। সংসারের দশচক্রে বেঁধে ফেলা হয়েছিল মোনিকা গুপ্তা থেকে মোনিকা চন্দ-তে পরিণত হওয়া বিদূষী কন্যাটিকে। ■

# ওড়িশায় ব্যাডমিন্টনের হাই পারফরম্যান্স সেন্টার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

**ইরানে খোলা হাওয়া :** ইসলামিক রিপাবলিক ইরানে ফুটবল মাঠে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল সম্প্রতি। ফিফার নির্দেশে বা বলা চলে আদেশে সে দেশের মৌলবাদী প্রশাসন ফুটবল মাঠে মেয়েদের প্রবেশাধিকারের ওপর শিলমোহর দিতে বাধ্য হয়েছে। গত মাসে বিশ্বকাপ যোগ্যতা নির্ধারণী ম্যাচে কম্বোডিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ইরান। বিশ্বকাপ ফুটবলের মূলপর্বে বেশ কয়েকবার খেলেছে এশিয়ার অন্যতম সেরা দেশ ইরান। আর দেশের হিরোদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে আবেগের বন্যায় ভেসে গেছে কয়েক হাজার ইরানি যুবতী। বহু বছর পর মেয়েরা স্টেডিয়ামে ঢোকার অনুমতি পেয়েছে, যে ঘটনায় গোটা ইরানি সমাজ আলোড়িত। ফিফা প্রেসিডেন্ট গিয়ানি ইনক্যানটিনো নিজে সেদিন স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে ইরানি মেয়েদের উচ্ছ্বাস দেখে অভিভূত। এরপর কি পালা বদল ঘটবে সৌদি আরবে? ফিফা গোটা বিশ্বে ফুটবলের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম মৌলবাদী মুসলমান দেশগুলোতে মেয়েদের স্টেডিয়ামে ঢোকার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ফুটবল খেলতে দেওয়ারও অঙ্গীকার। যে দেশ ফিফার সিদ্ধান্ত মানবে না সেই দেশকে বিশ্ব ফুটবলের মূল স্রোত থেকে বের করে দেওয়া হবে। আর তা হলে অর্থনৈতিকভাবেও কমজোরি হয়ে পড়বে সেই সব দেশ। তাই কোনো দেশই ফিফার সিদ্ধান্ত অস্বীকার করতে পারবে না।

**নাইজেরিয়া কোচের মায়ের যুক্তি :** নাইজিরিয়ার বিখ্যাত ফুটবলার কাম কোচ ম্যানসন সিয়াসিয়ার মা ওপেরে সিয়াসিয়াকে নিজেদের হেফাজত থেকে মুক্তি দিল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। গত জুলাই মাসে তাকে একটি বহুজাতিক মল থেকে তুলে নিয়ে গেছিল কয়েকজন বন্দুকবাজ দুষ্কৃতী। নাইজিরিয়ায় ইদানীং বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলিটকে বা তাদের পরিবারের সদস্যকে তুলে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন ও পুলিশ কিছুতেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। নাইজিরিয়া এমনিতেই সমৃদ্ধ দেশ আর তারকা খেলোয়াড় বা কোচেরা একটু বেশিই সচ্ছল। তাই তারা দুষ্কৃতীদের সফট টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ম্যানসন তিনটি বিশ্বকাপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। টানা ৫ বছর জাতীয় কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন। তার মাকে কোনো আর্থিক দাবিদাওয়ার শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্য পুলিশ বা পরিবারের তরফে জানানো হয়নি। তবে তাকে কোনোরকম হেনস্থা করা যায়নি।

**আন্ডারওয়াটার হকি জনপ্রিয় হচ্ছে :** আন্ডারওয়াটার বা জলের নীচে অক্টোপাস হকি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায়। ১৯৫০-এর দশকে গ্রেট ব্রিটেনে উদ্ভাবন হলেও ইউরোপে এখনো দানা বাঁধতে পারেনি এই খেলা। পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে। স্কুবা ডাইভিং, স্পরকেল, সি সার্ফিংয়ের মতো জনপ্রিয় খেলার সঙ্গে ইতিমধ্যেই পাল্লা দিতে শুরু করেছে এই খেলা। স্পরকেল পোশাক, ক্ষুদ্র ও স্বচ্ছ গিয়ার, বাঁকানো স্টিক সহযোগে খেলতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান গেমসে প্রদর্শনী খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে খেলাটি। মূলত শীতকালে খেলা হয় শারীরিক ভাবে তরতাজা থাকার জন্য। অনেকটা ওয়াটারপোলোর মতো ভারসাম্য ও শরীর সঞ্চালন করতে হয়। তার ওপর শক্তি ও গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক। তই সবদিক তৈরি হয়েই এই খেলায় পারদর্শিতা দেখাতে হয়। অচিরেই পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ঢুকে পড়বে খেলাটি কারণ শ্বেতাঙ্গরা একটু বেশিই অ্যাডভেঞ্চার গেম ভালোবাসে।

**ওড়িশায় হাইপারফরমেন্স সেন্টার :** ৫০ কোটি টাকা খরচ করে ভুবনেশ্বরে হাইপরফরমেন্স ব্যাডমিন্টন সেন্টার গড়ে উঠতে চলেছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই অসামান্য উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর পরে ভুবনেশ্বর হয়ে উঠবে ব্যাডমিন্টনের নয়া দিগদর্শন। ওড়িশা ইতিমধ্যেই হকিকে প্রমোট করে বিশ্ব বৃত্তে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। আন্তর্জাতিক মানের সমস্ত রকম পরিকাঠামো, পরিষেবা ও পরিবেশ তৈরি করে বিশ্বপর্যায়ের সব টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজন করেছে। এবার নজর দেওয়া হচ্ছে ব্যাডমিন্টনে। সেরাজ্যে ইদানীং ব্যাডমিন্টনের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে পিভি সিন্ধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার পরে। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকারা বেশ কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এসব দেখে সে রাজ্যের কিশোর-যুব প্রজন্ম হকির পাশাপাশি ব্যাডমিন্টনের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক বলেছেন, প্রাক্তন বিশ্বসেরা খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের পরামর্শ ও উপদেশ মেনে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ হাই পারফরমেন্স সেন্টার গড়ে উঠবে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের ভিতর চার একর জায়গা জুড়ে। যা কিনা গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমিকেও ছাপিয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। ■

# ফুটবলের রাজা মারাদোনা

ছোটো বন্ধুরা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখে গেছেন, মানুষের যদি বড়ো হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে তাহলে তাকে কোনো বাধা টলাতে পারে না। তার সহায় সম্পদও জুটে যায়। সুতরাং

আমরা যদি বড়ো হতে চাই, আমাদের মনের মধ্যে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে তাহলে কোনো বাধাই বাধা বলে মনে হবে না। আজকে আমরা খেলার রাজ্যের এক রাজপুত্রের কথা আলোচনা করব।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়, ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনার নাম আমরা শুনেছি। ১৯৮৬ সালে বিশ্বের সেরা এগারো জন ফুটবল খেলোয়াড়ের মধ্যে মারাদোনা ছিলেন অন্যতম। ওই বছর তিনি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন। কিন্তু এই সম্মান পাবার নেপথ্যে ছোটোবেলা থেকে তাঁর যে কী প্রচণ্ড উদ্যম আর অধ্যবসায় তা অনেকেই জানে না। সেই লক্ষ্যের প্রতি স্থির ছিলেন তিনি।

মারাদোনার বাড়ি আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্‌এয়ার্স শহরে। বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। বাবা কারখানার সামান্য শ্রমিক। তাঁরা গরিবদের পাড়ায় থাকতেন। মারাদোনার ডাকনাম ছিল দিয়াগো। ছোটোবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তাঁর বাবার আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, ছেলেকে একটা ফুটবল কিনে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। তাই কাগজের বল তৈরি করে মারাদোনা খেলে বেড়াতেন। বাবা ছেলের উৎসাহ দেখে একদিন চামড়ার বল কিনে দিলেন। মারাদোনার উৎসাহ তখন আরও বেড়ে গেল।

ধীরে ধীরে দিয়াগোর খেলার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক ভদ্রলোকের কানে দিয়াগোর কথাটা যেতেই তিনি এলেন দিয়াগোর সঙ্গে দেখা করতে। দিয়াগোর খেলা দেখে ভদ্রলোকের খুব ভালো লাগল। ভদ্রলোক দিয়াগোকে নিয়ে গেলেন নিজের ক্লাবে খেলার জন্য। দিয়াগোর বয়স তখন আট-নয়।

ক্লাবের কর্তারা মুখ বেঁকিয়ে বলল, এই পুঁচকে ছেলেটা কী খেলবে? ভদ্রলোক বললেন, দেখিই না একটু সুযোগ দিয়ে। নিমরাজি হয়ে দিয়াগোকে খেলার সুযোগ দেওয়া হলো। প্রথম দিনেই দারুণ খেলল দিয়াগো। কালক্রমে সে হয়ে উঠল দলের এগারো জনের মধ্যে একজন। দিয়াগোর জন্য সেই দল আর্জেন্টিনার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হলো। তখন দিয়াগো আর্মান্ডো মারাদোনার বয়স মাত্র তেরো। তার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে একটি নামকরা ক্লাব অনেক টাকা দিয়ে মারাদোনার সঙ্গে চুক্তি করল। আর ক'বছর পর মারাদোনার এমন নাম হয়ে গেল যে স্পেনের বিখ্যাত বার্সোলোনা ক্লাব ন'কোটি টাকা ফি দিয়ে মারাদোনাকে স্পেনে নিয়ে যায়। এরপর মারাদোনাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

ছোটো বন্ধুরা, ফুটবল খেলোয়াড়, ফুটবলের রাজা মারাদোনার জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা হলো, নিজেকে বড়ো করার দায়িত্ব নিজের হাতেই রয়েছে। মারাদোনা এমন একটা আর্থিক সঙ্গতিহীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বিশ্বের সেরা একজন ফুটবল খেলোয়াড় হতে পেরেছিলেন শুধু ইচ্ছাশক্তি আর একাগ্রতার জোরে। মনের মধ্যে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে, আর থাকে প্রবল একাগ্রতা তাহলে মানুষ তার লক্ষ্যসাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

তাই বড়ো হতে গেলে দরকার যেমন ইচ্ছাশক্তি তেমনি পরিশ্রম, ধৈর্য, সংযম, বিচক্ষণতা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সবগুলি গুণেই গুণান্বিত ছিলেন মারাদোনা।

**বিশ্বজিৎ সাহা**

**বিঃদ্রঃ- গত ১৮ নভেম্বর সংখ্যায় নবাঙ্কুর বিভাগে ড. শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ভুলবশত ১৯০৯ হয়েছে। হবে ১৯০১।**

## ভারতের পথে পথে

# গঙ্গোত্রী

বরফাবৃত মাতৃপর্বত শিখরে পর্বতচূড়ার ব্যূহের মাঝে পাইন ও দেবদারুগাছে ঘেরা গঙ্গোত্রী। প্রথম দর্শনেই আধ্যাত্মিক আবেশে দেহ মন গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনস্থল ভাগীরথী গঙ্গার উৎসস্থল গঙ্গোত্রী। পাহাড়ের খাত বেয়ে এসে কেদারগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে আকাশ কাঁপিয়ে পাহার গুঁড়িয়ে মনে হয় স্বর্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রকৃতিসৃষ্ট শিলারূপী শিবলিঙ্গের ওপর। কথিত আছে, প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে শিবশঙ্কর এখানে বসেই নিজ জটাজালে রুদ্ধ করে গতিরোধ করেন গঙ্গার। জলমগ্ন পাথররূপী শিবলিঙ্গ আজও বিদ্যমান। ৩০৪২ মিটার উচ্চে শ্বেতপাথরের ২০ ফুট উঁচু সোনালি শিখরযুক্ত মা গঙ্গার মন্দির রয়েছে। মন্দির লাগোয়া গঙ্গোত্রী বাজার। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপাবলী মন্দির খোলা থাকে। রয়েছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, যমুনা, অন্নপূর্ণা, ভগীরথ ও আদি শঙ্করাচার্যের মন্দির।

## জানো কি?

- মানুষ একই সঙ্গে দুটো নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাসগ্রহণ করে না। প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর পরিবর্তন হয়।।
- সৌদি আরব ও ভেনেজুয়েলাতে পেট্রলের থেকে পানীয় জলের দাম বেশি।
- প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন চাঁদের আয়তনের সমান।
- মেরুপ্রদেশে বস্তুর ওজন ৩ শতাংশ কমে যায়।
- ডাক্তারবাবুদের খারাপ হাতের লেখার কারণে পৃথিবীত প্রতি বছর ৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

## ভালো কথা

# কালীপুজোয় কুমারী

কালীপুজোর কয়েকদিন আগে সুকেশদাদু একদিন আমোদের বাড়িতে এসে মাকে বলল, এবার কালীপুজোয় তোমাদের মিষ্টিকে আমরা কুমারীপুজো করব ঠিক করছি। আমি দেখলাম মায়ের মুখখানা আনন্দে ভরে উঠেছে। মা রাজি হলো। আমাকে মা কুমারীপূজা কী তা বুঝিয়ে বলল। আমারও খুব আনন্দ হলো। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যায় মা আমাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে কোলে করে প্রতিমার পাশে বসিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুরমশাই আমাকে পুজো করলেন। স্বস্তিকার জয়ন্তদাদু আমার পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করছিলেন। পুজো শেষ হলে ছোটো বড়ো সবাই আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছিলেন। আমার বাবা-মাও প্রণাম করেছে। বড়োরা চকোলেট দিয়েছে। আমি সেদিন সারাদিন শুধু ফল খেয়ে ছিলাম। সারাদিন না খেয়ে থেকে আর পুজোয় অনেকক্ষণ বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু মনটা আনন্দে ভরে উঠছিল।

**স্নেহা নন্দী, প্রথমশ্রেণী, ১১,চন্দ্রশূর লেন, কলকাতা-৬।**

***তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।***

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| (১) না কু ন দা | (১) য় নী ত্য প্র নি য়ো জ |
| (২) ঞ্জ নী খ র | (২) ত্তা বা নী নি হি রা প |

**১৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) রঘুনন্দন (২) রঘুবংশ

**১৮ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর**

(১) রঘুকুলনন্দন (২) শ্রীরামজন্মভূমি

**উত্তরদাতার নাম**

(১) সুমিতা মণ্ডল, মল্লারপুর, বীরভূম। (২) সুতপা মল্লিক, মিলিকপাড়া, পূর্ব বর্ধমান (৩) ঈশিতা জানা, বড়বাজার, বর্ধমান (৪) শ্যাম হাঁসদা, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# ।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৪।।

১৯২৩ সাল। ইংরাজদের চাল সফল হলো। মুসলমানরা নানাভাবে হিন্দু সমাজের বিরোধিতা শুরু করল। রাস্তায় বাজনা বাজানোয় আপত্তি তুললো। ইংরেজরা তাদেরই মদত দিতে থাকল। লোকে ভীত হয়ে পড়ল। তখন ডাক্তারজী নিজেই অনেকবার ঢোল পিটতে পিটতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন।

১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীর পুণ্য লগ্নে ডাক্তারজীর বাড়িতে ১৫ জনের উপস্থিতিতে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হলো।

মোহিতে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষে ভরা একটা জমি ছিল। সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ডাক্তারজী কোদাল, গাঁইতি ইত্যাদি চালিয়ে তাকে খেলার যোগ্য করে তুললেন।

এক রবিবার সকালে সব স্বয়ংসেবকদের গণবেশ পরে সঙ্ঘের মাঠে হাজির হওয়ার কথা। কিন্তু আগেরদিন ডাক্তারজীকে ৩২ মাইল দূরে আড়েগাঁওয়ে যেতে হলো। ফেরার কোনো গাড়ি ছিল না। পায়ে কাঁটা ফুটেছে। বৃষ্টি, কাদা, তবুও হাঁটতে লাগলেন।

উদ্যমীকে পরমেশ্বরও সাহায্য করেন। সাত মাইল চলার পর—

ক্রমশ

# নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও কমিউনিস্টরা

**ড. জিষ্ণু বসু**

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সঠিক খবর ভারতে পৌঁছোতে কয়েক দশক লেগেছিল। মার্কিন সাংবাদিক জন রিড লিখেছিলেন 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন'। সেই দুনিয়া কাঁপানো দশদিনের সত্য-মিথ্যা ভরা বর্ণনা ভারতের তরুণ বিপ্লবীদের হৃদয়কে ছুঁয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর মনকেও নাড়া দিয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকদের তথাকথিত গণ আন্দোলন। তাই ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে তাঁর ভাষণের শেষ অংশে তিনি বললেন, ''যতদিন না পর্যন্ত আমরা শ্রমিক কৃষক এবং বঞ্চিত মানুষের প্রকৃত ক্ষোভ অভিযোগকে তুলে ধরতে না পারব ততদিন সামাজিক অসহযোগ আন্দোলন সফল হবে না। যদি আমার পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তবে আমরা স্বরাজের পথে অনেকটা এগিয়ে যাব।''

কয়েক বছর পরে সুভাষচন্দ্র ইউরোপে গিয়েছিলেন। সেই বিস্তৃত প্রবাসে সেখানে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র, ওখানকার বড়ো বড়ো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানকার রাজনৈতিক গতিবিধি খুব কাছ থেকে দেখলেন। বুঝলেন ফ্যাসিজম্ আর কমিউনিজমের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য। ১৯৩৫ সালে তাঁর 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থ লন্ডন থেকে প্রকাশিত হলো। ইংরেজ সরকার আগেভাগে নিষিদ্ধ করল বইটি।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নেতাজী সুভাষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালেও একবার তাঁদের কথা হয়েছিল। মাঝে সুভাষচন্দ্রের কথা নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীও একবার নাগপুরে এসেছিলেন। ১৯৪০ সালের ১৯ জুন রামভাউ রুইকরকে নিয়ে নেতাজী আসেন ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে। ডাক্তারজী তখন মৃত্যুশজ্জায়। তাঁদের আর কথা হয়নি। তার দুদিন পরেই ২১ জুন ডাক্তারজীর দেহাবসান হয়। তাই ডাক্তারজীর পরামর্শ আর তাঁর নেওয়া হয়নি।

১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে যখন নেতাজী অন্তর্ধান করলেন, তখনও সম্ভবত সুভাষচন্দ্র বসুর আস্থা ছিল কমিউনিস্টদের উপর। তাঁর কাছে দেশের স্বার্থ ছিল সবচেয়ে বড়ো। দীর্ঘ ইউরোপ বাসের সময় হয়তো কমিউনিজম আর ফ্যাসিবাদের স্বরূপ তাঁর কাছে একই মুদ্রার দুই পিঠ বলে মনে হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন এই দুই সর্বগ্রাসী শক্তির মধ্যে চরম বিরোধ আসন্ন। তাই যে ইংরেজের শত্রু হবে সেই ভারতবাসীর মিত্র। শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র।

ইংরেজের জাতশত্রু ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। নেতাজী আফগানিস্তানের পথে রাশিয়ায় পৌঁছোলে সুভাষচন্দ্র বসুকে রুশ গুপ্ত সংস্থা পিপলস কমিশারিয়েট ফর ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স (এন কে ভি ডি) মস্কোতে নিয়ে এল। কিন্তু যে আশা নিয়ে সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্ট রাশিয়াতে গিয়েছিলেন স্ট্যালিনের রাশিয়া তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিল। নেতাজী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। যদিও ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তিনি প্রথমে কমিউনিস্ট রাশিয়ার কাছেই হাত পেতেছিলেন, তবে প্রতারিত হয়েছিলেন।

প্রতারিত, আশাহত নেতাজী মস্কোর জার্মান দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ডন ডার সুলেনবার্গের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিই বিশেষ বিমানে বার্লিনে নিয়ে যান সুভাষচন্দ্র বসুকে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে নেতাজী বার্লিনে পৌঁছোলেন। তখন হিটলারের নাৎসি পার্টির সরকার। নাৎসি পার্টির ইংরেজি তর্জমা ন্যাশেনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কাস পার্টি। তাই একটি সমাজবাদী শ্রমিক দল কালের কপোলতলে ফ্যাসিবাদের কালঘাম হয়ে জমা হয়েছিল। আসলে উগ্র সোশ্যালিজম আর ফ্যাসিজমের মধ্যে খুব সামান্য সূক্ষ্ম পার্থক্য।

তাই নেতাজী সুভাষের জার্মানিতে যাওয়া এবং অক্ষশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করার মধ্যে কোনো আদর্শগত পক্ষপাত ছিল না, ছিল বিশুদ্ধ দেশপ্রেম। যুদ্ধে মিত্রশক্তি আর অক্ষশক্তি সমান নিষ্ঠুর কাজ করেছে। হিরোসিমা আর নাগাসাকি তো হিমশৈলের চূড়াটুকু মাত্র। জার্মানি, জাপানি বা ইতালির সাধারণ মানুষের উপর মিত্রশক্তি বহু অত্যাচার করেছে। পরমাণু বোমা ফেলা হবে রাশিয়া বহু আগে জানত, জেনেও প্রতিবাদ করেনি। তাই তারাও সমান অপরাধী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি হেরে গেলে ইতিহাসটা অন্যভাবে লেখা হতো।

নেতাজী বহু কষ্টে ভারতের বাইরে থাকার যুদ্ধবন্দি ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী তৈরি করেছিলেন। সেই বাহিনী উত্তরপূর্ব ভারতের মৈরাং পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। নেতাজীকে আন্দামানে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু আন্দামান ও নিকোবরের নাম রাখলেন স্বাধীনদ্বীপ আর স্বরাজদ্বীপ। বার্লিন রেডিয়োতে সুভাষের গলায় বাংলা ভাষায় 'আমি সুভাষ বলছি' শুনে দেশবাসী পুলকিত। সেদিন শুধু বীরের বেশে ফিরে রাজ্যাভিষেকের পর্বটাই বাকি!

সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া কী করছিল? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ছিল পিপলস ওয়র। ১৯৪২ সালের ১৯ জুলাই সেখানে প্রথম পাতাতেই নেতাজী সুভাষের কার্টুন ছাপা হলো। সুভাষচন্দ্র জাপানের প্রধানমন্ত্রী তেজোর কুকুর। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ওই পত্রিকায় এস. জি. সরদেশাই নেতাজীর নামে চরম বিষোদগার করলেন। ১৯৪৩ সালের ১৮ জুলাই পিপলস্ ওয়র পত্রিকায় কমরেড জি. অধিকারীর একটি লেখা এই পর্যায়ে সবচেয়ে ভয়ানক। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো প্রাতঃস্মরণীয় একজন বীর দেশনেতাকে নিয়ে এমন মিথ্যা কুৎসা আর কখনো লেখা হয়নি।

১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মুখার্জি কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিটিতে কলকাতার অধ্যাপিকা পুরবী রায় এবং অধ্যাপক হরিবাসুদেবনও ছিলেন। জাস্টিস মুখার্জি তার রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে বলেন যে ১৯৪৭ সালের পরেও নেতাজী সুভাষ বেঁচে ছিলেন। এবং সম্ভবত রাশিয়ার সাইবেরিয়ার কোনো জেলেই অন্তত ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বন্দি ছিলেন।

১৯৫০ সালে মাঝামাঝি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অজয় ঘোষ, এস.ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও, মেকিনেগি বাসবপুন্নায়ার রাশিয়াতে গিয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারা কয়েকদিন ধরে টানা বৈঠক করেছিলেন জোসেফ স্ট্যালিন, ভাইচেসলভ মিখাইলোভিচ মলোটভ, মিখাইল আন্দ্রেইভিচ সুসলভ বা গ্রেগরি ম্যালেনকভের মতো শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতবর্ষে সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ঠিক সেই সময়ই রাশিয়ার সাইবেরিয়ার চরম শীতে বন্দিদশায় মৃত্যুর জন্য দিন গুনছিলেন ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জনগণমন অধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

# অযোধ্যা মামলায় ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং মানুষের বিশ্বাস একে অপরের পরিপূরক

**বিনয়ভূষণ দাশ**

দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পরে দেশের শীর্ষ আদালত 'রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ' বিতর্কের রায় দিয়েছে গত ৯ নভেম্বর। নিষ্পত্তি হয়েছে কয়েক শতকের বিবাদের। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, তথাকথিত বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া হলো হিন্দুদের রামমন্দির গড়ার জন্য এবং অযোধ্যারই কোনো স্থানে ৫ একর জমি সরকার দেবে মসজিদ নির্মাণের জন্য। এই রায়ে আপাতদৃষ্টিতে সকলপক্ষই সন্তুষ্ট। কোথাও কোনো প্রতিবাদ বা অসন্তুষ্টির খবর নেই। কিন্তু বাদ সেধেছে কিছু চিরকালীন কৈকেয়ীর দল।

যাইহোক, এই প্রসঙ্গে রাম জন্মভূমির ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রথমে রাম জন্মভূমির ধর্মীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের দেশে শ্রীরাম হলেন হিন্দুদের সবচেয়ে আরাধ্য দেবতাদের একজন। তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসেবে গণ্য করা হয়। রামায়ণ অনুযায়ী শ্রীরাম অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রানি কৌশল্যার জ্যেষ্ঠপুত্র; জন্মেছিলেন রাজধানী অযোধ্যায়। আবার গরুড় পুরাণ অনুযায়ী অযোধ্যা হলো সাতটি 'মোক্ষ' প্রদায়িনী নগরীর একটি। 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' নামে একাদশ শতকে সংকলিত এক গ্রন্থে 'জন্মস্থান' নামাঙ্কিত এক স্থানকে রামের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, স্থানটি এক পবিত্র তীর্থস্থান। অযোধ্যা এবং তার আশপাশের স্থানগুলিকে নিয়ে 'রামদুর্গ' নামে একটি দুর্গশহর গড়ে তোলা হয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবেও অযোধ্যা শহরটি বিখ্যাত ছিল গুপ্তযুগ থেকেই। গৌতম বুদ্ধের সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে নগরটি 'সাকেত' নামে পরিচিত ছিল এবং শহরটি উত্তর ভারতের ছয়টি বড়ো শহরের অন্যতম ছিল।

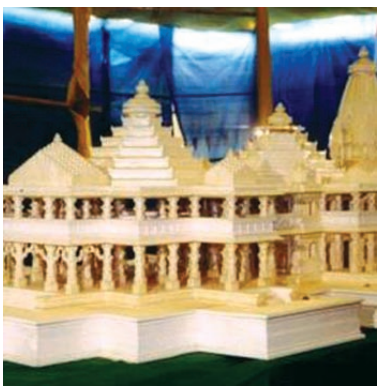

গুপ্তরাজত্বের সময়ে কুমারগুপ্ত স্থানটিকে সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে মনোনীত করেন। কথিত আছে, মহাকবি কালিদাস এখানেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'রঘুবংশম' রচনা করেন। ফ্রান্সিস বুকানন এবং অ্যালেক্সান্ডার কানিংহামের মত অনুযায়ী, রামের স্বর্গারোহণের পরে স্থানটি পরিত্যক্ত হয় এবং গুপ্তরাজ বিক্রমাদিত্য পরে স্থানটি আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। আবার কালিদাসের রঘুবংশমের মতে, স্থানটি পুনরুজ্জীবিত করেন রামের পুত্র কুশ। গুপ্তরাজগণের পরে ক্ষমতায় আসেন গাহড়বাল বংশীয় রাজাগণ। এই বংশের রাজাগণ অনেক বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেন যার মধ্যে পাঁচটি আউরঙ্গজেবের সময় অবধি টিকে ছিল। আউরঙ্গজেব সেগুলি ধ্বংস করেন। ভারততত্ত্ববিদ হ্যান্স টি বাক্কের মন্তব্য করেছেন যে, রামজন্মভূমিতে গাহড়বাল রাজাদের নির্মিত একটি মন্দির অবস্থিত ছিল। স্থানীয় হিন্দুদের বিশ্বাস, অধুনা বিলুপ্ত বাবরি মসজিদের স্থলেই রাম জন্মেছিলেন। আর রাম জন্মভূমির জায়গাতেই ১৫২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে মোগল আক্রমণকারী বাবরের সেনাপতি মির বাকি বা বাকি তাসখন্দি মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করে। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ পর্যটক উইলিয়াম ফিনচ (William Finch) অযোধ্যা ভ্রমণ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, স্থানটি ছিল রামচাঁদ বা রামচন্দ্রের প্রাসাদ এবং গৃহের ধ্বংসাবশেষ। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে তিনি কোনো মসজিদের উল্লেখ করেননি। ১৬৩৪ সালে টমাস হারবারট বর্ণনা করেছেন, স্থানটিতে একটি 'অপূর্ব প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ' বিরাজমান ছিল। ১৫২৮ থেকে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি প্রাপ্ত কোনো নথিপত্রে ওই স্থানে কোনো মসজিদের উল্লেখ নেই। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজপুত রাজা সওয়াই জয় সিংহ উল্লিখিত স্থান ও তার আশপাশের জায়গা কিনে নেন। তাঁর দলিল-দস্তাবেজেই প্রথম একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি কাঠামোর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু সেটি উল্লিখিত হয়েছিল 'জন্মস্থান' বা 'ছঠী' হিসেবে, মসজিদ হিসেবে নয়। স্থানটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উঁচু ভিত্তি বা প্লাটফর্ম ছিল যেখানে হিন্দুরা পূজা করতেন। রাম জন্মস্থানের জমির স্বত্ব অর্পিত করা হয়েছিল দেবতার প্রতি অর্থাৎ জন্মস্থানটি ছিল 'দেবত্র' সম্পত্তি। আর এই মালিকানা ১৭১৭ থেকেই মুঘল বাদশাহদের স্বীকৃত। এসমস্ত তথ্যই জেসুইট পাদ্রী জোসেফ টিফেনফেলার সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ''that once upon a time, here was a house where Beschan (Bishnu) was born in the form of Ram.'' এখানে উল্লেখ্য যে, জোসেফ টিফেনফেলার ১৭৬৬-১৭৭১-এর মধ্যে অযোধ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। ১৮১০ সালে ফ্রান্সিস বুকানন অযোধ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিও লিখেছেন, যে কাঠামো ভেঙে মসজিদ গড়া হয়েছিল সেটি রামের স্মৃতিতে তৈরি মন্দির। পরবর্তীকালের অনেক আকর গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে একটি মন্দির ভেঙে তার স্থলে কথিত মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগে অবধি মন্দির ভেঙে বাকি মিরের তৈরি মসজিদটিকে 'মসজিদ-ই-জন্মস্থান' নামে অভিহিত করা হতো, এমনকী সরকারি দলিলপত্র যেমন রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্র ইত্যাদিতে তাই

ছিল। বাস্তবেও মধ্যযুগে বেশিরভাগ মসজিদ তৈরি হয়েছিল হিন্দু মন্দির ভেঙে। সবই জবরদখল করা। ফলে কোনো মসজিদেরই স্বপক্ষে কোনো দলিলদস্তাবেজ থাকার কথা নয়; হয়েছেও তাই। উচ্চতম বিচারালয়ে তাই মসজিদের জমির স্বপক্ষে কোনো দলিলদস্তাবেজ দেখাতে পারেনি বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি।

ঐতিহাসিক শেখ আজামত আলি কাকোরাওয়ি নামি (১৮১১-১৮৯৩) তাঁর গ্রন্থ 'তারিখ-ই-অবধ' এ বলেছেন, ''The Babari mosque was built up in 923 A.H. (?) under the patronage of Sayyid Musa Ashiqanin the Janmasthan temple in Faizanbad-Avadh, which was a great place of (worship) and capital of Ram's father.'' এইচ আর নেভিল তাঁর সম্পাদিত Faizabad District Gazetteer (1905) এবং Darabanki District Gazetteer এ লিখেছেন যে জন্মস্থান মন্দির ''was destroyed by Babur and replaced by a mosque.'' তিনি আরও লিখেছেন, ''The Janmasthan was in Ramkot and marked the birthplace of Rama. In 1528 A.D. Babur came to Ayodhya and halted here for a week. He destroyed the ancient temple and on its site built a mosque, still known as Babur's mosque. The materials of the old structure (i.e. the temple) were largely employed, and many of the columns were in good preservation.'' মৌলভি আব্দুল করিমের লেখা পার্সিয়ান পুস্তকেও রাম জন্মস্থান মন্দির ভেঙে সেই স্থানে বাবরি মসজিদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। আবার আকবরের সভাসদ ও আকবরনামার লেখক আবুল-ফজল-ইবন-মুবারক ১৫৯৮-এ লেখা আইন-ই-আকবরিতে অযোধ্যায় 'জন্মদিন উৎসব' অর্থাৎ 'রামনবমী' উৎসব, রামের বাসস্থান, পবিত্রতম স্থান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন অযোধ্যা সম্পর্কে কিন্তু তিনিও কোথাও কোনো মসজিদের কথা উল্লেখ করেননি। শুধু তাই নয়, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ ওই বিদ্রোহে হিন্দুদের সমর্থনের শর্তে হিন্দুদের মন্দির ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। ঘটনাক্রমে মুসলমানদের ভারতে আগমনের পরে এই প্রথম কোন মুসলমান শাসক হিন্দুদের সমর্থনের বিনিময়ে তাঁদের কোনো ধর্মস্থান ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন, যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। মুসলমানরা বহিরাগত হলেও কিন্তু হিন্দুরা তাঁদের বিভিন্ন সময়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করে এসেছে। শুরু থেকেই হিন্দুরা এই রাম জন্মভূমি মন্দির পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেছে বারে বারে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে লাখে লাখে। ১৭১৭, ১৮৫৩, ১৮৫৫, ১৮৫৯, ১৮৮৩, ১৯৪৯, ১৯৮০—স্থানীয় হিন্দুরা বার বার চেষ্টা করেছে রামমন্দির পুনরুদ্ধার করে সেখানে এক অপূর্ব জন্মস্থান মন্দির তৈরি করতে। এমনকী শাহ্ গোলাম হুসেনের নেতৃত্বে মুসলমানরা ১৮৫৫ সালে এক যুদ্ধে হিন্দু বৈরাগীদের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরেও যায় হনুমানগড়িস্থিত তথাকথিত মসজিদ দখল করতে গিয়ে। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ্। তিনি হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটিও গড়েন এই বিবাদ মেটাতে। যদিও কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ওখানে মন্দিরেরই অবস্থানের পক্ষে মত দেয়। হিন্দুদের প্রতিরোধের ফলে ওয়াজিদ আলি শাহ্ এ ব্যাপারে আর এগোননি। আবার ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গোরক্ষনাথ মঠের মহান্ত দিগ্বিজয় নাথ পূর্বোক্ত রামায়ণ মহাসভায় যোগদান করেন এবং একনাগাড়ে ৯ দিন ধরে 'রামচরিত মানস' পাঠের ব্যবস্থা করেন। এই সময়েই, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে রাম ও সীতার মূর্তি আবির্ভূত হয় বলে কথিত। সেকুলার বলে কথিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ফৈজাবাদের জেলাশাসককে ওই মূর্তি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু ফৈজাবাদের তৎকালীন জেলাশাসক কে কে কে নায়ার ধর্মীয় গণ্ডগোলের আশঙ্কায় ওই নির্দেশ কার্যকরী করেননি। ফলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

যাইহোক, মোটের উপর হিন্দুরা বার বার রাম জন্মভূমি উদ্ধারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন বিদেশি মুসলমান এবং ইংরেজ সরকারের দ্বারা। হিন্দুদের এই যুদ্ধ এবং মন্দির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও আত্মত্যাগের কাহিনি বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা চেপে গিয়েছে সর্বদা। হিন্দু স্বাভিমানের ইতিহাস অকথিত থেকে গেছে। রামশরণ শর্মা, ইরফান হাবিব, মহম্মদ হাবিব, রোমিলা থাপার প্রভৃতি ঐতিহাসিক এই ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে এই ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবীরা বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের বিমর্ষ হবার কারণ, জে এন ইউ-তে কোনো বিক্ষোভ হলো না, উপত্যকায় কোনো ইট ছোড়া হলো না, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো মিছিল বেরোল না। এমনকী আমাদের এই যাদবপুর আর প্রেসিডেন্সিতেও কোনো 'হোক কলরব' হলো না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই উচ্চতম বিচারালয়ের রায় বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ওই সব স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের এই রায় কিছুতেই যেন হজম হচ্ছে না!

অথচ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, বিচারালয়ের নির্দেশে ১৯৭০, ১৯৯২, ২০০৩ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ ওই বিতর্কিত স্থলে সর্বেক্ষণ চালিয়ে কথিত মসজিদের নীচে নানা পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পেয়েছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দশম শতকের উত্তর ভারতীয় গঠনশৈলীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে ওই মসজিদের নীচে যাতে প্রমাণিত হয় যে এক বিশাল মন্দিরচত্বর অবস্থিত ছিল মসজিদের নীচে। বি বি লাল, কে কে মহাম্মদ প্রমুখ পরাতাত্ত্বিক ওই বিতর্কিত জমির নীচে মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ আছে বলে তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন। সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের এই রিপোর্ট মেনে নিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্ট, পর্যটকদের বিবরণ, মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলমান লেখকদের বিবরণ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র সমস্তই ওই তথাকথিত বিবাদিত স্থানে একটি হিন্দু মন্দিরের অবস্থিতি জোরালোভাবে প্রমাণ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দুদের আজন্মলালিত বিশ্বাস। প্রমাণ ও বিশ্বাস এখানে একে অপরের পরিপূরক। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ তাই সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন রামলালা বিরাজমানের পক্ষে এবং তিন মাসের মধ্যে একটি ট্রাস্ট গড়ে তাঁদের মাধ্যমে এক অপূর্ব রামমন্দির নির্মাণ করতে। এই রায় সব পক্ষের মেনে নেওয়াই হবে ভারতীয় যুক্তিশীল ঐতিহ্যের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন এবং কোর্টের এই রায় হিন্দু স্বাভিমানের প্রতীক। ▮

# ভারতের আশ্রয় প্রার্থী ‘কিং অব করাচি’

**প্রিয়দর্শী সিন্‌হা**

বিশ্বের বুকে পাকিস্তানকে ‘ক্যান্সার’ বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে, গোটা দুনিয়ারই মাথাব্যথার কারণ এই পাকিস্তান। মুহাজির আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে এক সময়ে তিনি পাকিস্তানিদের চোখে হয়ে উঠেছিলেন ‘কিং অব করাচি’। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শান্তির সেতুবন্ধনের কাজেও অগ্রণী ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। নাম তাঁর আলতাফ হুসেইন। পাকিস্তানে ‘মুত্তাহিদা কউমি মুভমেন্ট’-এর জনক। কিন্তু ১৯৯২ থেকেই দেশছাড়া এই মুহাজির নেতা। ব্রিটেন থেকেই এতদিন রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালনা করছিলেন পাকিস্তানের মুহাজির আন্দোলন। সম্প্রতি সেখানেও তাঁকে ঘিরে অস্থিরতা। পাকিস্তানে সন্ত্রাস আর অরাজকতায় উস্কানি দেওয়ার জন্য তাঁকে দায়ী করে অভিযোগ দায়ের করেছে ইসলামাবাদ। তারই ভিত্তিতে সন্ত্রাস-বিরোধী আইনে আলতাফকে গ্রেপ্তার করেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। এখন অবশ্য জামিনে মুক্ত তিনি। তবে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এম কিউ এম-এর শীর্ষ নেতা। দিন কয়েক আগে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে প্রার্থনা মঞ্জুরের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। শুধু নিজের জন্য নয়, তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদেরও ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন আলতাফ। এবং কথা দিয়েছেন, আশ্রয় পেলে ভারতের কোনও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না তাঁরা। লক্ষণীয়, ‘করাচি কিং’ আলতাফ হুসেইন-ই সম্ভবত প্রথম ব্রিটিশ নাগরিক তিনি ভারতের আশ্রয়প্রার্থী।

কে এই আলতাফ হুসেইন? কেনই বা পাকিস্তানের মাটিতে দীর্ঘ ৪ দশক ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর অনুগামীরা। কীসের জোরে? উত্তরটা লুকিয়ে আছে মুহাজিরদের মনের গভীরে। দেশভাগ বা তার আগে-পরে উত্তর প্রদেশ, বিহার, দিল্লি-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের যে সব মানুষ পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁদেরই বলা হয় মুহাজির। অভিযোগ, পাকিস্তান তাঁদের যথাযথ স্বীকৃতি

না দেওয়ায় তাঁরা বছরের পর বছর অবহেলা এবং বঞ্চনার শিকার। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন আলতাফ এবং তাঁর দলবল। মুহাজিরদের জন্য মর্যাদা ছিনিয়ে আনতে আপোশহীন সংগ্রামের ডাক দেন তিনি। করাচিকে সিন্ধুপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ‘মুহাজির সুবাহ’ গঠনের দাবি তোলেন। বাস্তবিক অর্থে সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরেই। ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ‘পাকিস্তান মুহাজির স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন’-এর নেতৃত্বে উঠে আসেন তিনি। লক্ষণীয়, সেই সময়ে পাকিস্তান কাঁপছিল সামরিক শাসক জিয়া-উল-হকের ভয়ংকর ডিক্টেটরশিপে। অন্যদিকে ‘পাকিস্তান পিপলস পার্টি’কে সামনে রেখে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল গণতন্ত্রের দাবিদার বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি। লক্ষ্য করার বিষয়, ঠিক এই পরিস্থিতিতেই পিপিপি-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করাচি-সহ পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করতে তলে তলে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে আলতাফের দল। উর্দুভাষীদের মনও জয় করে নেন দ্রুত। তরুণ-যুব সম্প্রদায়ও ক্রমশ আকৃষ্ট হয় তাঁর ভাবধারায়। জোরদার হয় আলাদা ‘মুহাজির সুবাহ’ আদায়ের দাবি। ৮০ এবং বিশেষ করে ৯০-এর দশকে সামরিক শাসক তথা সরকারের রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে মুহাজির আন্দোলন। ক্রমেই তা মোড় নেয় সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। নেমে আসে শাসকের দমন-পীড়ন। ১৯৯২ সালে পাকিস্তান ছেড়ে লন্ডনে পাড়ি দিতে বাধ্য হন আলতাফ। কিন্তু থামানো যায়নি তাঁকে বা তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামীকে। করাচির জনসভায় লাখো মানুষের সমাবেশে লন্ডনে তাঁর মিল হিলের বাড়ি থেকেই ভেসে আসতো নেতার টেলিফোনিক কণ্ঠস্বর, ভাষণ। সেই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক সময় ব্যাপক অরাজকতাও বাঁধিয়ে বসতো উত্তেজিত জনতা। একবার তো আক্রান্ত হয়েছিল দু’টি টেলিভিশন চ্যানেলের অফিসও।

নাটকীয়ভাবে, যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে আলতাফ সাহেবের আন্দোলনের পালে ব্যাপক হাওয়া লেগেছিল ৯০ এর দশকের শেষের দিকে। সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে গদিচ্যুত করে জেনারেল পারভেজ মোশারফ ক্ষমতা দখলের পরেই। ঘটনাচক্রে মোশারফও দিল্লি থেকে আসা একজন মুহাজির এবং উর্দুভাষী। ফলে ১৯৯৯-তে পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুকূলে চলে আসে আলতাফ এবং তাঁর দলের। দ্রুত বাড়তে থাকে তাঁদের প্রভাব। দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও সুকৌশলে ব্যবহার করতে থাকেন জেনারেল মুশারফ। ২০০৭-এ আইনজীবীদের আন্দোলন ভেঙে দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে আলতাফের দল। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে করাচিতে এম কিউ এমের কর্মী-সমর্থকদের তীব্র বাধার মুখে পড়েন মুশারফের হাতে পদচ্যুত প্রধান বিচারপতি। আইনজীবীদের সঙ্গে আলতাফ অনুগামীদের প্রবল সংঘর্ষে প্রাণ হারান ২০ জনেরও বেশি মানুষ।

যতদূর জানা গেছে, ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে এখনও তেমন কোনও সাড়া পাননি মুহাজির আন্দোলনের এই শীর্ষ নেতা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এর যৌক্তিকতা বিচারের এক্তিয়ার শুধুমাত্র কেন্দ্রেরই। আইন, নিরাপত্তা-সহ অনেক প্রশ্নই জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। রয়েছে ঝুঁকি এবং কুটনীতির প্রশ্নও। যা গভীরভাবে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র দিল্লিই। ■

# ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট প্রকাশ করল কেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** বিচারাধীন বন্দি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য সম্বলিত কারাগারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 'প্রিজন স্ট্যাটিস্টিক্স ইন্ডিয়া' প্রকাশনায় ১৩,১৪৩ জন বিচারাধীন বন্দি বিভিন্ন কারাগারে তিন থেকে পাঁচ বছর আটকে রয়েছেন। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে অবশ্য এই ধরনের কোনো সমীক্ষা করা হয়নি। বিচারাধীন বন্দিদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুসারে কারাগার ও বিচারাধীন বন্দির বিষয়টি রাজ্যের তালিকাভুক্ত। এই কারণে কারাগারের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্বই রাজ্য সরকারগুলির। তবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিচারাধীন বন্দিদের বিষয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফৌজদারি প্রক্রিয়ার ৪৩৬-এ ধারা অনুযায়ী কোনো বিচারাধীন বন্দি যদি

সর্বোচ্চ দেড় বছর আটকে থাকে, তাহলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তবে, যেসব বন্দির অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তারা এই ধারার আওতায় পড়বে না। কারাগারে বন্দিদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-প্রিজন্স পোর্টাল থেকে পাওয়া যাবে।

মন্ত্রী আরও জানান, স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিভিন্ন থানা, কারাগার ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে প্যারা-আইনি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেছে। তিনি আরও জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, জাতীয় আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (নালসা) বিচারাধীন বন্দিদের বিষয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিয়োর তৈরি করেছে যা গত ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পাঠিয়েছে।

# ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য সুসংহত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে 'সমগ্র শিক্ষা' কর্মসূচির সূচনা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৯ সালে সকলের শিক্ষা আইন চালু করে। এই আইন অনুযায়ী, ভিন্নভাবে সক্ষম-সহ সব শিশুদের মুক্তভাবে এবং বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

'সমগ্র শিক্ষা' প্রকল্পে বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সব ধরনের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, যাতায়াতের সুবিধা, প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের মতো একাধিক সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে এই প্রকল্পে। এমনকী, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষকদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে এই প্রকল্পে। 'সমগ্র শিক্ষা'র উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা যাতে শ্রেণীকক্ষে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পঠন-পাঠনে অংশ নিতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. রমেশ পোখরিয়াল 'নিশাঙ্ক'।

# বায়ু দূষণ হ্রাস করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** দেশে বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা প্রতিহত করতে কেন্দ্র 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ' কর্মসূচির আওতায় জাতীয় স্বচ্ছ বায়ু প্রকল্প চালু করেছে। এর আওতায় সুসংহত পদ্ধতিতে ২০২৪ সালের মধ্যে পিএম-১০ এবং পিএম-২.৫-এর ঘনত্ব ২০-৩০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই ঘনত্ব ২০১৭ সালের বায়ুর মানের ভিত্তির ওপর নির্ধারিত। গাঙ্গেয় সমভূমি এলাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ১০২টি শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৪/২০১৮-র প্রতিবেদন অনুযায়ী বায়ুর মান নির্ধারণ সংক্রান্ত নজরদারি হয় না।

২০১৮ সালে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে সুসংহত কর্মসূচি কেন্দ্র গ্রহণ করেছে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'সমীর' অ্যাপের সূচনা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জনগণ এই অ্যাপের মাধ্যমে বায়ু দূষণ সংক্রান্ত নানা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে বাতাসের গুণমানের তথ্য সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠানো হচ্ছে। জনগণ বাতাসের গুণমান সংক্রান্ত তথ্য ট্যুইটার, ফেসবুক-সহ একটি দায়বদ্ধ সংবাদব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জানাতে পারছেন। পরিবেশ রক্ষায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তুলতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে। ১ লক্ষ স্কুলে 'ন্যাশনাল গ্রিন কর্পস' কর্মসূচির আওতায় ইকো ক্লাব গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরিবেশ সংরক্ষণের নানা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

# পরিবেশ-বান্ধব ইস্পাত তৈরির লক্ষ্যে ইস্পাত শিল্পগুলিকে একযোগে কাজ করার আবেদন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** পরিবেশ-বান্ধব ইস্পাত তৈরির লক্ষ্যে ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইস্পাতমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ভারতীয় ইস্পাত সংস্থা (আইএসএ) আয়োজিত আইএসএ স্টিল কনক্লেভ ২০১৯-এ বক্তব্য রাখার সময় বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, দায়িত্বশীল দেশ হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০ গিগাওয়াট ধার্য করেছি। পরিবেশ-বান্ধব ইস্পাত নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের শিল্প সংস্থাগুলিকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, পূর্ব ভারতে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত ইস্পাত কারখানাগুলিকে

উর্জা গঙ্গা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মন্ত্রী আরও বলেন, শিল্প বিপ্লব, ৪.০ বিগডেটা ডিজিটাইলাজেশন, কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও সমাজে পরিবর্তন আসছে।

দেশে ইস্পাতের ব্যবহার প্রসঙ্গে শ্রী প্রধান বলেন, ভারতে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সঠিকভাবে ইস্পাত ব্যবহারের বিষয় 'ইস্পাতই ইরাদা' কর্মসূচি চালু করেছি। দেশের পরিকাঠামোয় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে, ইস্পাতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় অর্থনীতি হলো উপভোক্তা-নির্ভর। যেহেতু, অর্থনীতির আকার বাড়ছে, ইস্পাতের ব্যবহারও সেই মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, ইস্পাত শিল্পে আমরা কেন রপ্তানি করতে পারছি না, তার কোনও কারণ নেই। আমাদের দেশ গঠন করার লক্ষ্যে ইস্পাত শিল্পের প্রসার ঘটানো উচিত। আর এভাবেই ভারত ইস্পাত রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। আর সি ই পি-তে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এর ফলে ইস্পাত শিল্পের সুবিধা হবে।

# জৈব প্রযুক্তিতে বিশ্বে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ভারতের রয়েছে : ডাঃ হর্ষবর্ধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ভূ-বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন বলেছেন, জৈব প্রযুক্তিতে ভারতের

শীর্ষস্থানে পৌঁছনোর ক্ষমতা রয়েছে। তিন দিনের আন্তর্জাতিক বায়োইন্ডিয়া শীর্ষ বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় সম্প্রতি তিনি বলেন, ভারতে জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশ জুড়ে জৈব প্রযুক্তি স্থাপনে সরকার উৎসাহ দিচ্ছে এবং হাজার হাজার নতুন উদ্যোগকে সহায়তা জোগাচ্ছে।

ডাঃ হর্ষবর্ধন বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন। সারা বিশ্বে বিজ্ঞান সংক্রান্ত তৎপরতা বৃদ্ধির হার যেখানে ৫ শতাংশ, ভারতের ক্ষেত্রে এই হার ১৪ শতাংশ। মন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রযোজিত মিশন ইনোভেশন কর্মসূচিতে ভারত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। স্মার্ট গ্রিড, অফ গ্রিড এবং স্থায়ী জৈব জ্বালানির ক্ষেত্রে দেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে আমরা যেন নতুন ভারত গঠন করতে পারি, যার মাধ্যমে ভারত 'বিশ্বগুরু'তে পরিণত হবে। পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইস্পাত মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, সরকার পরিবহণ জ্বালানিতে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। যখন এই পরিকল্পনাটি হাতে নেওয়া হয়, সেই সময় ১ শতাংশেরও কম ইথানল মিশ্রণ করা হতো, আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে অতিরিক্ত খাদ্যকণা থেকে ইথানল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আমাদের 'অন্নদাতা'রা উর্জা দাতায় পরিণত হবেন।

গ্লোবাল বায়ো ইন্ডিয়া সম্মেলনে শিক্ষাবিদ, উদ্ভাবক, গবেষক, শিল্পোদ্যোগী এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। ২৫টি দেশের ৩ হাজার প্রতিনিধি এবং দেশের ১৫টি রাজ্যের থেকে অংশগ্রহণকারীরা এখানে যোগ দিয়েছেন। ২০০-রও বেশি প্রদর্শনকারী ২৭৭টি নতুন উদ্যোগ এবং জৈব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন ১০০ জন এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

# প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে জালিয়ানওয়ালাবাগের পবিত্র মাটি ভর্তি 'কলস'

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিংহ প্যাটেল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের পবিত্র মাটি ভর্তি 'কলস' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় স্মারক পরিদর্শনের সময় এই মাটি নিয়ে এসেছিলেন। পরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এই 'কলস' জাতীয় সংগ্রহশালায় সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হবে। তিনি আরও বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন সেইসব শহিদদের যুবসম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের ১০০ দিনের

সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন। শ্রী প্যাটেল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাজমহলে শিশুদের খাওয়ানোর জন্য 'বেবি ফিডিং রুম' তৈরি করেছে। দেশের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে এই ধরনের 'বেবি ফিডিং রুম' তৈরি করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের দর্শনীয় স্থানগুলিকে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সাইনবোর্ডগুলি বিদেশি ভাষায় লেখার ব্যবস্থা করেছে মন্ত্রক। ভারতবর্ষে যাতে আরও বেশি করে বিদেশি পর্যটক আসতে পারেন তার জন্য ই-ভিসার মাশুল কমানো হয়েছে এবং হোটেলে পণ্য ও পরিষেবা কর কমানো হয়েছে। পর্বতারোহীদের জন্য ১৩৭টি শৃঙ্গ খুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে ভারতের পর্যটন সূচক ৪০ থেকে ৪৪-এ উঠে এসেছে বলেও তিনি জানান।

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

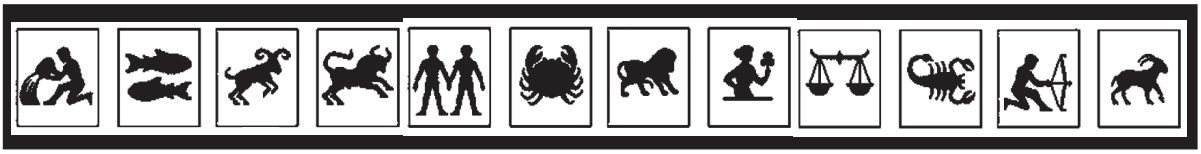

**২ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ৮ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, তুলায় মঙ্গল, বুধ, বৃশ্চিকে রবি, ধনুতে বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, কেতু। ৫-১২ বৃহস্পতিবার বৈকাল ৪-২৮ মিনিটে বুধের বৃশ্চিকে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে শ্রবণা নক্ষত্র থেকে মেষে অশ্বিনী নক্ষত্রে।**

**মেষ :** আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা কঠিন। চোট-আঘাত, বকধার্মিক মিত্রজালে জর্জরিত সময়। বুদ্ধি, দক্ষতা ও কুশলতায় কর্মে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধায় বিদ্যার্থীর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। প্রেম-প্রণয় ও পরিণয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। চাকরি প্রার্থীদের জন্য সুখবর, পরিবারে নবজাতকের আগমন, জীবনসঙ্গীর ব্যক্তিত্বে প্রতিকূলতার অবসান। সমাজ ভাবনায় সফল মনস্কাম।

**বৃষ :** স্বজন সম্পর্ক ও গৃহের নেতিবাচক পরিবেশ অস্বস্তির কারণ। সন্তানের মেধার বিকাশে গুণীজনের সহায়তা ও প্রতিষ্ঠা। প্রযুক্তিবিদ, গণিতজ্ঞ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যানুরাগীর নির্দিষ্ট বিচারধারা ও নতুন চিন্তাভাবনায় সাফল্যের অনেক পালক সংযোজিত হবে। একাধিক পন্থায় উপার্জন ও নতুন আঙ্গিকে আগামীদিনের পথচলা।

**মিথুন :** হৃদয়ের উদারতা ও সমাজকল্যাণে দান-ধ্যান, সজ্জন সান্নিধ্যে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। অগ্রজসম কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও প্রতিবেশীর কৌতূহল বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করুন। ব্যবসায়ীদের নতুন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরাক্রমী পদক্ষেপে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। গঠনমূলক কাজে নিকট ভ্রমণ।

**কর্কট :** আর্থিক লেনদেন ও লিখিত চুক্তি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দুরূহ কাজে কঠিন পরিচয়ে আপোশহীন যোদ্ধা ও সম্মান। গৃহ সংস্কার নব নির্মাণ, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি ও তীর্থ দর্শনের লোভনীয় হতছানি। গৃহে আড়ম্বর পূর্ণ বৈবাহিক অনুষ্ঠান। লিভার-রক্তাল্পতাও মূত্রাশয়ের চিকিৎসা দেখা দেবে।

**সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অসহযোগিতা ও নিজ ভুলে মানসিক চাপে পড়ার সম্ভাবনা। সন্তানের শরীর, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃতা। বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত বাসনার পূর্তি ও সন্তানলাভ। কর্মপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ চিন্তা দূর হওয়ার সম্ভাবনা। স্বীয় আদর্শ বাগ্মিতা ও বুদ্ধিমত্তায় সামাজিক সম্মান ও শংসা।

**কন্যা :** ঋণ, অর্থকষ্ট, পিয়জনের ও প্রেম-ভালোবাসায় আঘাত। গোপনীয়তা বজায় রাখুন, অন্যথা স্থায়ীকাজের পরিবেশে অস্থিরতা সৃষ্টি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শত্রুরা দমিত হবে। পুরানো লগ্নিতে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শুভ। পুলিশ, সৈনিক আই বি, খেলোয়াড়দের সুকীর্তি ও সম্মান প্রাপ্তি। জমি সংক্রান্ত কাজে আশু সমাধানে বিলম্ব। চোখ, দাঁত ও শরীরের নিম্নাঙ্গের চিকিৎসার প্রয়োজন।

**তুলা :** জীবনসঙ্গীর দুর্ভাবনা, দুর্বাক্য, হঠকারিতায় শত্রুবৃদ্ধি। কোমল হৃদয়বৃত্তি ও পরোপকারের ফলবতী প্রচেষ্টা। গুরুজনে ভক্তি-শ্রদ্ধা, আত্মীয় সমাগম, শ্রী ও সুন্দরের পূজারি। উপার্জন বৃদ্ধিতে বিধি বহির্ভূত পথের হাতছানি। নতুন কর্ম পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ স্থগিত রাখুন। সন্তানের অসামাজিক মনোভাবে ব্যথিত বোধ।

**বৃশ্চিক :** পারিবারিক কর্তব্য সমাধায় মানসিক চাপ থাকলেও হতাশার কালো মেঘ অপসাহিত হবে। সন্তানের বিভাগীয় পরীক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানান্বেষণের নব উদ্ভাবনী শক্তির আনন্দে সপ্রতিভতা। কর্মের যোগসূত্রে রমণী সান্নিধ্য ও বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা অর্জন।

**ধনু :** সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে উজ্জ্বল কীর্তি ও বর্ণময় চরিত্র। চলমান সপ্তাহে ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি ছায়াসঙ্গী হিসেবে লেগে থাকবে। জীবনসঙ্গীর বুদ্ধিমত্তা ও দীপ্তিমান ব্যক্তিত্বে সামাজিক শংসা ও জনপ্রিয়তা। সপ্তাহের শেষভাগে পারিবারিক অস্বস্তিকর পরিবেশ, ঋণজালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

**মকর :** অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সুদৃঢ়র পক্ষে অনেক নতুন সুযোগে মনের উৎফুল্লতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি। বিদ্যাজনিত যশ, সংকীর্তি, বসন, ভূষণ, বাহনাদি লাভে পার্থিব সুখ। আন্তর্জাতিক ও তরল ব্যবসায় প্রসার লাভ। কর্মপ্রার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশের অন্তিমমার্গে প্রতিবন্ধকতা। উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, দাঁত ও মান-সম্মানের ক্ষেত্রে সপ্তাহের শেষভাগ সতর্কের।

**কুম্ভ :** গৃহে ক্রমশ শুভ প্রভাব তবে অগ্রজের সঙ্গে সম্প্রীতির অভাব ও জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যাবনতি উদ্বেগের। সংগীতপ্রেমী, চলচ্চিত্র শিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও বিদ্যার্থীদের অডিশন, বিভাগীয় পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে সফলতা ও কর্মজনিত যশ প্রাপ্তি। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'র ন্যায় ব্যবসার প্রসার, কুলদেবতার প্রতি ও গুরুজনে ভক্তি-শ্রদ্ধা। সপ্তাহের মাঝামঝি সময়ে পুরাতন ঝামেলায় পবিত্র মন কলুষিত হবে।

**মীন :** শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত ও কথাবার্তায় শান্ত- সংযত ও গোপনীয়তা বজায় রাখুন। অন্যথায় কর্মস্থানে বিরুদ্ধাচারণে বদলির আশঙ্কা। নিজ ব্যক্তিত্ব গঠনমূলক কাজে সুহৃদ সম্পর্ক ও দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। সন্তানের আধুনিকতার পরশে চ্চল মানসিকতা ও প্রেম পর্যায়ের নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা। জীবনসঙ্গীর নামে অংশীদারি ব্যবসায় বিনিয়োগের শুভ সময়।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য